কিশোর-সঞ্চয়ন

প্রতিভা বসু

সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ, গোয়ালটুলি লেন,
কলকাতা-৭০০০১৩

প্রথম প্রকাশ ঃ
বৈশাখ ঃ ১৩৭২

প্রকাশক ঃ
প্রসূন কুমার বসু
সমকাল প্রকাশনী
৮/১এ, গোয়ালটুলি লেন,
কলকাতা-৭০০০১৩

প্রচ্ছদ ঃ
গৌতম রায়

অলংকরণ ঃ
জয়ন্ত চৌধুরী

প্রচ্ছদ ব্লকঃ
সি বি. এইচ প্রসেস (ক্যালকাটা)
কলকাতা-৭০০০০২

মুদ্রাকর ঃ
তারক ঘোষ
রামকৃষ্ণ প্রেস ।
কলকাতা-৭০০০১৪

মিমিকে

সূচী

ছোটো বড়ো	৯
সব চেয়ে যা বড়ো	৫৪
ভাই বোন	৬৮
দুই বোন	৮৩
পটলি	৯৬
প্রতিবেশী	১০৫
বড়োপিসির ছোটোছেলে	১১৩

ছোটো বড়ো

হেমন্তকাল, এই সময় অসুখবিসুখ লেগেই থাকে তার উপর দিনগুলো স্যাৎসেতে হলে তো সোনায় সোহাগা।

যজ্ঞেশ্বর মল্লিক মাথার বেড়ে টুপিটা পকেট থেকে বার করলেন। এটা পকেটেই রাখেন সর্বদা, যাতে দরকার হলেই ব্যবহার করতে পারেন। আসবার আগে কল্পনাই করেননি চট করে এরকম একটা ঠাণ্ডা পড়ে যাবে। কাচ ঢাকা গাড়ির ভিতরেও কেমন কনকনে শীতে হাত পা তাঁর জমে যেতে চায়। টুপিটা মাথায় পরে নিলেন। এখানে এসেই কিনেছেন একটা ভুটিয়ার কাছ থেকে। একটা সোয়েটারও কিনেছেন। সেটা পরে নিতে পারলেও বেশ হতো।

কিন্তু বেরিয়েছেন সেই কোন ঝাঁ-ঝাঁ দুপুরে। তখন তো রীতিমতো গরম লাগছিলো, অথচ সূর্য ডুবলো কি কেমন শীত! আসলে শরীরটাই খারাপ হয়েছে, কে জানে জ্বরটর হলো নাকি।

তাঁর স্বাস্থ্য এমনিতে খুব ভালো। সাতষট্টি আটষট্টি বছর বয়সেও খুব মজবুত। ঈশ্বর তাঁকে চমৎকার যন্ত্রপাতি দিয়ে তৈরী করে ভবধামে পাঠিয়েছেন, সহজে কিছু হয় না। অসুখ বিসুখ করেই না বলা যায়। মনেও পড়ে না কবে জ্বর জ্বালায় ভুগেছেন। সবাই বলে তাঁকে দেখলে নাকি পঞ্চাশের উপরে ভাবা যায় না। চামড়া টান টান, চুল কালো, চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল, দাঁত সন্নিবদ্ধ। এই কয়েকদিন আগেই হঠাৎ কেমন মাথা ঘুরলো একদিন! ডাক্তার বললো, প্রেসার বেড়েছে, সাবধানে থাকবেন। আর সাবধান! রাখে কৃষ্ণ মারে কে

আর মারে কৃষ্ণ রাখে কে। ওসব তিনি গ্রাহ্য করেন না। শরীরের মধ্যে সত্যিই কোনো অসুবিধে নেই তাঁর। এটা মস্ত আশীর্বাদ।

কিন্তু এখানে এসে থেকেই দেখছেন, কেমন এটা ওটা হচ্ছে। ভালো লাগে না। হাতটা হঠাৎ ব্যথা হচ্ছে কেন বুঝতেই পারছেন না। অবশ্য শুধু দেহগত অশান্তিই সুরু হয়নি, মানসিক ভাবেও খুব সুস্থির বোধ করছেন না! মনে হচ্ছে শারীরিক মানসিক দুই অর্থেই বেশ একটা সংকটের মধ্যে পড়েছেন। নতুন কারখানাটা বড়ো অশান্তির কারণ হলো। তার উপরে আবার নতুন জঙ্গলও ইজারা নিয়েছেন একটা। বোধ হচ্ছে না ব্যাপারটা সুখকর বা কার্যকর হবে।

যাদের উপর তাঁর এখানকার কারবারের সমস্ত ভার ন্যস্ত আছে তাদেরই জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে আজ তিনদিন যাবত তিনি এখানে এসেছেন। যেদিন এলেন সেদিনই ডাক্তারের কাছে গিয়ে একটা থরো চেকিংয়ের কথা ছিলো। হলো না। নইলে ভেবেছিলেন, ডাক্তারের পরামর্শ মতো সত্যিই বিশ্রাম নেবেন কয়েকদিন।

নেবেন। এই ঝঞ্ঝাটটা চুকিয়েই কোনো নির্জন জায়গায় গিয়ে ডুব মারবেন কাজ থেকে। সাবেক কারখানার ম্যানেজারকে বলেওছেন সে কথা। শুনে তো তিনি হায় হায় করে উঠেছেন। তাঁর ধারণা তাঁর অবসর মানেই কর্মক্ষেত্রে লালবাতি। বলেন, 'সময়টা বড়ো গোলমেলে। এই তুফানে তরী ঠিক রাখা আপনি ছাড়া আর কারো কর্ম নয়। আমি বইঠা বাইতে পারি, হাল ধরে আপনাকেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।'

একথায় মনটা ভরে যায় যজ্ঞেশ্বরের। হা হা করে হাসতে হাসতে বলেন, 'না হে, পাল তুলে দিয়েছি, অনুকূল বাতাস আপনিই চালিয়ে নেবে যেখানে নেবার।'

প্রকৃতপক্ষে বিশ্রাম তাঁর নিজেরই ধাতে সয়না। বিশ্রাম নেবার কথা ভাবলেই মনে হয় মরে গেছেন। তাঁর মতে কাজই লক্ষ্মী, কাজই জীবন। কাজ করতেই তিনি অভ্যস্ত, কাজ করতেই সবচেয়ে বেশী ভালোবাসেন। কাজ, কাজের জায়গা, কাজের জায়গার মানুষেরা সব নিয়েই তাঁর অস্তিত্বের মূল্য। তারাই তার পিতামাতা ভাইবোন স্ত্রীপুত্র পরিবার সব।

দুই

বেশ একটি বড়ো কারখানার মালিক তিনি। নানা ধরণের জিনিসেরই চালানদার, তার মধ্যে জাহাজের কী একটা অংশ তৈরী হয় যা সারা ভারতে মল্লিক ফ্যাক্টারি ছাড়া অন্যত্র কোথাও পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে তাঁর তুল্য দক্ষ লোক বিরল।

এই অঞ্চলে কাঠ সস্তা, তাই বছর কয়েক আগে একটি জঙ্গলের বন্দোবস্ত নিয়ে নতুন ব্রাঞ্চ খুলেছেন। স্তর অনুযায়ী প্রত্যেক কর্মীকেই যথাযোগ্য বেতন দিয়ে থাকেন তা ব্যতীত অন্যান্য সুখ সুবিধারও বন্দোবস্ত আছে। একান্ত কুলি কামিনরাও তাদের বড়ো বাবার কাছে উপেক্ষা বা অনাদরের পাত্র নয়। তাঁর সাহায্যের হাত সকল কর্মীদের জন্যই সর্বদা প্রসারিত।

এতোকাল তো সবাই মিলে এক পরিবারের মতোই ছিলো, কিছুকাল যাবতই যেন কেমন সব অন্যরকম।

নাঃ, শরীরটা সত্যিই খারাপ হয়েছে। গলায় হাত বুলোলেন, কম্ফোটারটা ভালো করে জড়ালেন। বেড়ে টুপিটা খুলে আবার ঠিকঠাক করে বসালেন, হাতটা ব্যায়ামের ভঙ্গিতে ওঠানামা করালেন কয়েকবার। এই হাত ব্যথার জন্যই ডাক্তার বুকের ছবি নিয়েছে, এটা নাকি হৃদয়গত ব্যাপারের বিপদ সংকেত। কে জানে। ওরা তো

কতোই বলে। আসবার ঠিক আগেই এসব কথাবার্তা, হঠাৎ চলে আসায় কথা কথাতেই আবদ্ধ থাকলো, ফিরে গেলে তবে সব হবে।

ফিরে তিনি শীগগিরই যাবেন। এভাবে, এরকম কাতর শরীর নিয়ে এই নির্বান্ধব জঙ্গলে পড়ে থাকলে ভারি মুশকিল। দেখবে কে? বলা যায় ওখানেই বা তার কে আছে! রক্তের সম্পর্কের কেউ নেই তা ঠিক। কিন্তু ওখানকার পরিবেশটাই তার পরম বান্ধব। কোনো কোনো কর্মী তার সন্তানের অধিক। তিনি জানেন, তারা আছে, একান্ত আপন হয়ে আছে। পড়ে থাকলে সেবা শুশ্রূষা মমতা মনোযোগ সবই তিনি তাদের কাছ থেকে পাবেন।

কিন্তু এ জায়গায় সেটা সম্ভাবনার পরপারে। হঠাৎ কেমন ভয় হলো। অমাবস্যার রাত, কাচ ঢাকা গাড়ির ভিতর থেকে বাইরের চলন্ত দৃশ্যেও তাকিয়ে চোখ ডুবে গেল অন্ধকারে। বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের লম্বা রাস্তা মনে হলোনা এ জীবনে তাকে আর কোনো গৃহের নিরাপত্তায় পৌঁছে দেবে। মাথার উপর অনন্ত আকাশের বিস্তার, পুঞ্জ পুঞ্জ তারা সব যেন একটা ভয়ের ইসারায় সমুজ্জ্বল। এই ভয়টা ভালো না। যে কোনো ভয়ই মানুষকে পরাস্ত করে। এতোদিনের মধ্যে একদিনও তো কখনো কোনো ভয় তাকে এভাবে আক্রমণ করেনি। আজ কী হলো? সামান্য শরীর খারাপেই এই অবস্থা? আশ্চর্য!

তবে কি এতোদিনে সত্যিই বয়েস বাড়লো তার। এটাই কি বার্ধক্যের লক্ষণ? নিজের কপালে নিজেই হাত ছুঁইয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করলেন। আবার হাতটা ওঠালেন নামালেন। মনে হলো ব্যথাটা যেন সারা দেহেই ছড়িয়ে পড়ছে।

শরীরে না মনে? মনেই। শরীর খারাপের জন্য বিচলিত হবার পাত্র নন তিনি। হতো মনের কারণেই শরীরও বেঁকে বসেছে।

একটা অমঙ্গলের গন্ধ পাচ্ছেন। এই গন্ধ বাতাসে সুদূর শব্দের মতো তাঁর আসল কারখানায়ও প্রবহমান। সেটা নগণ্য। কিন্তু এখানকার গন্ধ তীব্র। কারখানার সুখী শ্রমিকদের অসুখী দৃষ্টি থেকেই তা বেরিয়ে আসছে। সেই দৃষ্টিই বিঁধছে তাঁকে। তিনি বুঝতে পারছেন ভিতরে ভিতরে কী এক চক্রান্ত চলেছে, যার টার্গেট হচ্ছেন তিনি। কী যেন তারা বলতে চায়, কী অভিযোগ যেন কালো কালির মতো জমা হয়েছে। এই ধোঁয়া স্বতোৎসারিত নয়, তৈরী করা ক্লেদ। এবং এই ক্লেদ এদের নবনির্মিত ইউনিয়ন থেকেই বিষোদগার করছে। যে চারদিন তিনি এখানে এসেছেন, তার মধ্যেই লক্ষ্য করছেন, মধ্যে মধ্যেই জড়ো হচ্ছে ওরা, নেতা গোছের কেউ বক্তৃতা দেয় জোর গলায়, ওরা একাগ্র হয়ে শোনে, তারপরেই ধর্মঘটের হিড়িক। দাবী সম্বলিত ব্যানার নিয়ে মিছিল করে।

যজ্ঞেশ্বর বোকা নন। বহুঘাটের জল খেয়ে হজম করেছেন। এই হাওয়ার ঘুড়ি কাদের দ্বারা উড্ডীন তা তিনি বুঝছেন। এই সব গরম গরম বক্তৃতার বিষয়টা কী, এর কতোখানি ফুটন্ত তা-ও বুঝেছেন। সমবেত জনমণ্ডলীর শ্রবণকে তা কতোখানি দগ্ধ করে সেটাও বোঝেন। শুধু একথাটাই বোঝেন না, মিছিমিছি কেন এরা জল ঘোলা করে। ঘোলা জল পরিস্রুত করুক সে তো বেশ কথা, কিন্তু কেবল মাত্র নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এতোগুলো অসহায় লোককে হাতিয়ার করে গোলমাল সৃষ্টি করা কেন? কেন তাদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দুঃখী বানানো।

কিন্তু আর তিনি এদের প্রশ্রয় দেবেন না, প্রয়োজন হলে ঘোড়াকে ঠুলি পরানোই উচিত। পিছনের পা খোলা আছে বলেই যে যেখানে সেখানে যা কিছুর উপর লাথি মেরে ভেঙে দেবে সেটা ঠিক

নয়। শক্তির ব্যবহার কোথায় প্রযোজ্য আর প্রযোজ্য নয় প্রথমে সেই শিক্ষা আয়ত্ত করতে হবে তাদের। প্রতিবাদের জায়গায় অবশ্যই প্রতিবাদ করবে, কিন্তু তার যে ক্ষেত্র বিশেষ আছে সে কথাটাও শিখতে হবে সেই সঙ্গে। তাদের জানতে হবে কারণ অকারণ বলে আছে কিছু। রোগ না হলেও রোগের দাওয়াই রোগীকে মৃত্যুর রাস্তাই প্রসারিত করে দেয়।

গাড়িটা চলছে তো চলছেই। যজ্ঞেশ্বরও ভাবছেন তো ভাবছেনই। মনে মনেই কারবারের একটা আয় ব্যয়ের হিসেব কষে নিলেন। সেই সঙ্গে নিজের পরিশ্রমের অঙ্কটাও কষে নিলেন। যাকে বলে-মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন। না, শরীর পতনের কথা তিনি ভাবেননি, মন্ত্রের সাধনই ছিলো মুখ্য। আর পরিশ্রমে শরীর পতন হয় এ কথা তিনি বিশ্বাস করেন না। পরিশ্রম যেমন জীবনকেও গড়ে তোলে তেমনি স্বাস্থ্যকেও সম্পদ দেয়। যা ঠিক, যা সৎ, ঠিক সেই ভাবে এগিয়ে যাও, কাম্য তুমি পাবেই পাবে। হ্যাঁ পাবেই। দয়া করে সামান্য চেষ্টাতেই হাল ছেড়ে দিওনা।

বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী। বাণিজ্য সত্যিই আজ তাকে শীর্ষাসন দিয়েছে। একার চেষ্টায় সব তিনি গড়ে তুলেছেন। ধৈর্য ধরে গড়তেই জীবনের অর্ধেকটা সময় কেটে গেছে, ঝড় ঝাপটা বিপদ হতাশা অন্ধকার সাঁতরে এই তো সবে তীর পেয়েছেন, এখনো বা শান্তি কই, স্বস্তি কই, বিপদের সংকেতে ছুটে আসতে হয়েছে সব ফেলে। ডুবলে তিনিই ডুববেন।

অথচ তাঁর আয়ের চারভাগের এক ভাগও তিনি নিজে রাখেন না। বলা যায় প্রায় সবটাই এদের জন্যই খরচ হয়। এদের মধ্যে

শুধু কারখানা আর কারখানার কর্মীই নয়, কোনো নদীর ধারে কোনো এক অখ্যাত গ্রামে দু'টি আশ্রম আছে। একটি আশ্রমে সত্তরটি রিফিউজি পরিবার বাস করে, অন্যটিতে প্রায় পাঁচশো ভিখিরি শিশু। তাদের খাদ্য বস্ত্র চিকিৎসা শিক্ষা সব'ভারই বহন করেন তিনি। কিন্তু রিফিউজিরা প্রায় স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে। ইচ্ছে আছে সংলগ্ন আরো কিছু জমি কেনেন, যাতে আরো পরিবার এসে কুটির বানিয়ে বাস করতে পারে। তিনি দেখেছেন তারা অলস বা অক্ষম নয়। তাঁদের উৎসাহ উদ্দীপনা উদ্যোগে কিছুরই কোনো অভাব নেই, অভাব ছিলো সামান্য সাহায্যের। সেইটুকু পেয়েই কেউ মাটি কোপাচ্ছে, কেউ ঘর বানাচ্ছে, কেউ স্কুল করছে, কেউ ছবি আঁকছে, কেউ গান করছে—যে যা পারে তাই দিয়েই তাদের জীবিকার্জন করছে তারা।

দেখাশুনো করার জন্য তাদের মধ্য থেকেই বেছে লোক নিয়েছেন যজ্ঞেশ্বর, তাঁদের হাতেই সমবণ্টনে ব্যয়িত হচ্ছে অর্থ। বাচ্চাদের জন্য দু'জন উৎসর্গীকৃত প্রাণ সন্ন্যাসিনী আছেন, তাঁরাই চালান মসৃণভাবে।

তিন

আয়ের যতো কম অংশই তিনি রাখুন না কেন, নিজের যাতে মসৃণ ভাবে চলে যায় এবং কিছু সঞ্চয়ও হয় সেদিকে তিনি যথেষ্ট সচেতন। একটা উইল করবার কথা ভাবছেন কদিন থেকে। বিবাহ করেন নি, ছেলেপুলে নেই, শেষ পর্যন্ত সবই এই ছেলেপুলেরা যাতে ভোগ করতে পারে তার বন্দোবস্ত করতে চান।

নিজের খুব বেশী চাহিদা বা বিলাসিতা তাঁর নেই, সেটা সত্য। কিন্তু না থাকলেও একেবারেই যে কিছু নেই তা নয়। একটার বদলে দশটা গাড়ি না হোক সেই একখানা গাড়ি ছাড়াই কখনো তিনি অন্য

বাহনে চড়েন না। চটকদার না হলেও মূল্যবান পোষাক পরিধান করেন, উত্তম খাবার খান, যোগ্য পাচক দিয়ে রান্না করান, সর্বরকমের আরাম যুক্ত একটি উৎকৃষ্ট বাড়িতে বাস করেন। বাড়িটি নিজের।

এখানকার বাড়িটাও নিজের। সুন্দর একটি কাঠের বাংলো তৈরী করে নিয়েছেন। সামনে লন, বাগান। জায়গা খুব নির্জন। নির্জনতাই পছন্দ করেন তিনি। সারাদিনের সব সবব খাটুনির পরে প্রকৃতির এই একান্ত স্পর্শ তাকে শুশ্রুষা করে।

এই নিয়ে এই বাড়িতে চতুর্থবার এলেন। কারখানা স্থাপিত হয়েছে পাঁচবছর আগে। অন্যান্য বার এসেছেন নিজে থেকে। এবার এসেছেন খবর পেয়ে। গোলমালের ফয়সালা এবং তা দমন করাই এবারকার উদ্দেশ্য। তাছাড়া ভেবেছেন শ্রমিকদের জন্য সাময়িক অপোক্ত কাঁচা ঘরগুলো এবার পাকা ব্যারাকে পরিণত করবেন।

আসলে আজকের মিটিংটা তাই নিয়েই ছিলো। প্ল্যান প্রোগ্রাম খবর সব পাকা করতেই রাত হয়ে গেল। নইলে ঠাণ্ডার মধ্যে এই শরীর খারাপ নিয়ে এতোক্ষণ থাকতেন না। আবারো-ভাবলেন, যতো তাড়াতাড়ি পারেন চলে যাবেন স্থানে স্থিতিতে। পারলে কাল নয়ত পরশু। ঐ জন্যই তাড়াতাড়ি সেরে নিলেন কাজ। বড়ো একটা চালান আছে। দেহযন্ত্র গুলোকেও সামান্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করানো তার উচিত। বড়ো সহজেই ঠাণ্ডা লাগছে, ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে মরতে চান না বীরের মতো কাজ করতে করতেই শেষ হয়ে যাওয়া তাঁর অভিপ্রায়।

এই কারখানায় আসল কারখানা থেকে অনেক পুরাতন পাকা মিস্ত্রিকেও এনেছেন তিনি, স্থানীয় নতুন শ্রমিকও নিতে হয়েছে।

পুরাতন মিস্ত্রিরাই স্বাভাবিক নিয়মে কণ্ট্রোল করছিলো তাদের, হাতে কলমে শিক্ষা দিচ্ছিল। কিছুকাল যাবত দেখা যাচ্ছে পুরোনোকে নতুনরা মেনে নিতে পারছে না। বড়োবাবার (যজ্ঞেশ্বর মল্লিককে তাঁর কর্মীরা বরাবরই এই বলে ডাকেন) ভক্তিমান এই চ্যালাদের তারা একেবারেই পছন্দ করছে না। তাদের দাবী দাওয়ার সঙ্গে এদের দাবী দাওয়া বা চাহিদা মিলছে না কোথাও। রুচিতেও না।

পুরোনোরা বলে, 'আমাদের বড়োবাবা আমাদের ভালো ছাড়া ভাবেন না কাজেই ভালো বুঝে যা দেন নিশ্চয়ই সেটা ন্যায্য।' নতুনরা বলে, 'সব বড়োবাবাই তোমাদের মতো মুর্খদের এই ভাবে ঠকিয়ে খায়, আমরা তার সেই মুখোসই ছিঁড়ে দেব।'

তারা বলে, 'মুখোস কি গো, হাতে কলমে সব কাজইতো আমাদের তাঁর কাছে শেখা। তিনি কতো সময় নিজে হাত লাগিয়ে কাজ করেন আমাদের সঙ্গে কতো সময় একসঙ্গে আমরা খাওয়া মাখা করেছি, একসঙ্গে ঘুমিয়েছি পর্যন্ত। সেবার সেই পালামৌর জঙ্গলে, ঈস, ঝুপড়ির মধ্যে তাঁকে কী একটা পোকায় কামড়েছিল, কই আমাদের ছেড়ে তো তিনি নেতার হাটের বাংলোয় গিয়ে থাকলেন না। আমরা তাঁর প্রাণ, আমরা তাঁর দয়াতেই সুখ চিনেছি।'

'সুখ চিনেছি?' তারা ক্ষিপ্ত গলায় বলে, 'গাড়ি চড়ে বেড়াও তোমরা? ডানলোপিলোর বিছানায় ঘুমোও। তোমাদের সেই বড়ো-বাবা না বুড়োবাবা তো ঘাড়ের রোঁ ফুলিয়ে মসনদেই বসে থাকে।'

তারা কানে চিমটি দেয়, 'তোবা তোবা, ওরকম বোলোনা। মাথা তাঁর, বুদ্ধি তাঁর, পরিশ্রম তাঁর, শিক্ষা তাঁর, টাকা তাঁর, সবই তো তাঁর। তিনিই তো বানিয়েছেন সব, বানিয়েছেন বলেই তো আমরা খেটে খেতে পারছি।'

'আর তিনি সোনার চামচে মুখে নিয়ে জন্মে কানে ধরে খাটাচ্ছেন তোমাদের। তোমাদের রক্তে তার ব্যাঙ্কে জমা হচ্ছে টাকা। চমৎকার।' এই বলে 'ভাই হো' হুঙ্কার দিয়ে নতুন এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার চেয়ারের উপরে উঠে বক্তৃতা দিতে থাকে। বক্তৃতা দিতে দিতে সকলের উদ্বুদ্ধ করার জন্য নানান রকম প্রক্রিয়ার দ্বারা সুক্ষ্ম অনুভূতিতে সুড়সুড়ি দেয়। কাঁদে হাসে ব্যঙ্গ করে বানিয়ে মালিকের লাভের হিসেব দাখিল করে, শেষ পর্যন্ত বুঝিয়ে ছাড়ে ঐ মালিক নামক জন্তুরা, বড়ো লোক নামক শত্রুরা কতো মিথ্যুক কতো অসৎ কতো নিষ্ঠুর কতো নির্লজ্জ, নির্বিবেক এবং শয়তান। প্রয়োজনে এরা খুনও করে তেলও মাখায়। এদের যারা বিশ্বাস করে সেই সব সরলমতি শ্রমিকদের উদ্ধার করার ব্রত নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে কয়েক জন ঋষিতুল্য দাদা, সেই দাদাদের প্রধান চ্যালাদের একজন তাদের উদ্ধার করতেই ঢুকেছে এই নোংরা কাজে, এই অন্যায়ের নরক কুণ্ডে। সুঁচ হয়ে ঢুকছে, দেখবি কেমন ফাল হয়ে বেরোয়।

শেষে টেবিলে মুষ্টাঘাত করে সুমন্ত চক্রবর্তী, রোষকষারিত লোচনে চারদিকে তাকিয়ে বুকে চাপড় মেরে বলে, 'আমার কথা সত্য কি মিথ্যা তা নিশ্চয়ই তোমরা এতোদিনে বুঝতে পেরেছ। তোমরা বারণ করেছিলে, আমি কি শুনেছি? শুনিনি। দাবী করে করে বুড়োটাকে ঠিক ঘাড় নোয়াতে বাধ্য করেছি। ভেবে ছাখো কতো পাইয়ে দিয়েছি তোমাদের। একবার নয়, দু'বার নয়, আমি এই চার বছর যাবত এসেছি, চারবার চাপ দিয়ে দিয়ে আদায় করেছি সুবিধে। সে কি আমার জন্য? না। তোমাদের জন্যে। তোমাদের মতো অক্ষম অসহায় ভায়েদের জন্য। এখন নিশ্চয় তোমরা অন্তত একথা মেনে নেবে যে দিতে পেরেও লোকটা দেয়নি। কিন্তু এবার তোমাদের আরো শক্ত

হতে হবে। এসেই শয়তানটা যে নিয়মকানুনের পতাকা তুলিয়েছে, সেই পতাকাটি ছিঁড়ে দিতে হবে। অর্থাৎ এই যে বোর্ড টাঙ্গিয়েছে 'ঠিক সময়ে আসবে, ঠিক সময়ে বেরুবে' কাজের সময় কাজ ফেলে আড্ডা করবে না, যখন তখন দলবদ্ধ হয়ে জটলা করবে না, ইচ্ছে মত কারখানা থেকে বেরিয়ে যাবে না, অকারণে কামাই করবে না, এই সব আব্দার মুছে দিতে হবে। এবারকার প্রথম দাবী হবে আমাদের সেটাই। তারপর অন্য কথা। রাজী?'

ধ্বনি উঠলো রাজী।

চার

এই সব বক্তৃতায় অবশ্য যজ্ঞেশ্বর উপস্থিত ছিলেন না, স্বকর্ণে শোনেননি তবে শুনেছেন। অন্যদের মুখে শুনেছেন। উড়িয়েও দিয়েছেন বালখিল্য বলে। বলেছেন সারাদেশ জুড়েই তো এই চলছে, একটু ঢেউ তো লাগবেই, কিন্তু সেই ঢেউ অন্তত আমার পরিবারকে উচ্ছেদ করতে পারবে না। আমি বিশ্বাস করি না আমার কারখানার শ্রমিকেরা আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। তারা আমাকে ভালোবাসে। কোন মন্ত্রণাই তাদের সেই জায়গা থেকে নড়াতে পারবে না।

একথা তিনি সগৌরবে প্রথম দিন ঘোষণা করেছিলেন সব শুনতে শুনতে। এই চারদিনের বসবাসে সেই ধারণায় ফাটল ধরেছে। এখন আর পুরোনো ম্যানেজার রমাপতি বাবুর আশংকাকে অমূলক বলে উড়িয়ে দিতে মন চায় না। শুধু একটা কষ্টে গলাটা বন্ধ হয়ে যেতে চায়।

পনেরো বছরের পুরোনো হিসেব রক্ষক সন্তোষ মণ্ডল বলে, 'স্যার এভাবে অনবরত যদি ওদের সব চাহিদা আপনি মেনে নিতে থাকেন,

ওরা কি কখনোই ভাববে আপনি কষ্ট করে দিচ্ছেন, দিতে পারেন না, তবু ওদের প্রয়োজন জানলে অস্থির হন বলেই দিচ্ছেন। ওরা ভাববে নিংড়োলেই যদি রস বেরিয়ে আসে তবে নিংড়োনোই হবে আমাদের আসল কাজ। ততোক্ষণে যে ছিবড়ে হয়ে যাবে সে বোধ ওদের নেই। সুতরাং চাহিদাও মিটবে না, ব্যবসাও চলবে না। বলতে গেলে চলছেই বা কোথায়? যা আয়, ব্যয় তো তার চেয়ে অনেক বেশী হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ।'

একথা সন্তোষ চিঠিতেও লিখেছিলেন। তাছাড়া স্পষ্টভাবে একথাও জানিয়েছিলেন সুমন্ত চক্রবর্তী নামে যে অল্পবয়সী ছেলেটিকে আপনি নিয়োগ করেছেন ক্রমেই সে বড়ো বেপরোয়া হয়ে উঠছে। তার আচার আচরণ খুবই দাম্ভিক। বয়স্ক লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা সব সময়েই উদ্ধত এবং অসম্মান জনক। রমাপতিবাবু আজ পর্যন্ত কখনো আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেননি যাতে আমরা একদিনের জন্যও মনে করতে পারি তিনি আমাদের মনিব। কিন্তু এই ছেলেটির ব্যবহারে মনে হয় এখানে যেন সে প্রভুত্ব করতেই এসেছে। আমরা সবাই তার হুকুমের দাস।

সেই সব চিঠি তখন তিনি আমলে আনেননি। এমন কি টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটে এসেছেন বটে কিন্তু উদভ্রান্ত হয়ে নয়। এসে পরিস্থিতি দেখে ভালো লাগছে না ব্যাপারটা তাই সকলকে ডেকে জড়ো করেছিলেন কাল। বলেছেন, 'এই যে আমি সব সময়েই তোমাদের সব আবদার মেনে নিয়েছি, তার কারণ এর মধ্যে যে তোমাদের কোনো দুরভিসন্ধি আছে সে কথা ঘুণাক্ষরেও মনে হয়নি আমার। এ জায়গা তোমাদের সকলের, তোমরা যার

যার গুণযোগ্যতা অনুযায়ীই আছো, থাকছো বেতন নিচ্ছ। তোমাদের সমবেত চেষ্টা পরিশ্রম এবং বিশ্বাসই আমার কারবারের মূলধন। কেবল চেঁচিয়ে গলা ফাটালেই কি সব কিছু হাতের মুঠোয় এসে যায়? তা কি সম্ভব? তার জন্য চাই নিয়মানুবর্তিতা, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং শ্রম। ইচ্ছেমতো কাজে আসবে, ইচ্ছে মতো চলে যাবে, ইচ্ছেমতো কামাই করবে, অকারণে জটলা পাকাবে; সেটা ঠিক নয়। তাতে লাভের চেয়ে লোকসানই হয় বেশী। এটা চাই,

ওটা চাই, সেটা চাই এছাড়া এই চারবছরের কাজের হিসাব প্রায় শূন্যের অঙ্কে। তোমরা কি চাও এখানকার কারখানাটা আমি তুলে দি? তুলে না দিলেও তোমরা যদি মনোযোগ দিয়ে কাজকর্ম না করো, নিজ থেকেই উঠে যাবে বাণিজ্য। সুতরাং সাবধান হও, নিজের পায়েই যে নিজেরা কুড়ুল মারছো সে বিষয়ে অবহিত হও। তোমাদের আমি সন্তানের মতো জ্ঞান করি, তোমাদের ভালো মন্দ আমারো ভালো-মন্দ। তোমাদের সবাইকে নিয়েই আমি।'

তাঁর এই সব কথা শুনে পুরোনো মিস্ত্রিরা 'ঠিক, ঠিক' বলে মাথা নেড়েছিলো। নতুনদের মধ্যে কে যেন অস্ফুটে বলে উঠেছিলো, 'শুধু মুনাফার বেলাতেই যা একটু একা।'

অবশ্য একথাটা তার কানে নতুন নয়। অনেক অশ্রাব্য ভাবেও বলে অনেকে। এই কটুক্তিতে তিনি ব্যথিত হন, আহত হন। বুঝতে পারেন এদের চাহিদা ঠিক দাহিদা নয়, হিংসা। এই হিংসা যে, তুমি কেন এতো বড়োলোক, আমি কেন গরীব। আচ্ছা, এটা কি একটা কথা? বড়োলোক কি তিনি চুরি করে হয়েছেন? নাকি কোনো অনুপার্জিত আয় ছিলো তার? এর পিছনে তাঁর কতো কষ্ট, কতো দুঃখ, কতো একাগ্রতা নিহিত আছে তা তিনি কেমন করে বোঝাবেন। শুধু নিজের জীবন দিয়ে জানাতে পারেন চেষ্টা থাকলে তার সার্থকতা হাতে হাতে না মিললেও কোনো না কোনোদিন মেলে।

পাঁচ

বাড়ি ফিরতে গাড়িতে চুপচাপ বসে এসব কথাই ভাবছিলেন। কেমন মনে হচ্ছিলো, এবার ছুটি নিলে হয়। কিন্তু কিসের থেকে ছুটি? কার কাছ থেকে ছুটি? বেঁচে থাকা আর ছুটি নেওয়া দুটো

তাঁর একসঙ্গে কোনোদিনই হবে না। এক প্রভু যদি চিরছুটিতে নিয়ে যান, সেটা আলাদা কথা।

বড় মাথা ধরেছে। এসব উৎপাত সত্যি কখনো ছিলো না। না হে, কাল সকালেই বাগডোগরা গিয়ে প্লেনে চাপতে হবে। এখানে কোনো অসুখ বিসুখ হয়ে পড়লে মুশকিল। এখানকার লোকজনেরা তাঁকে বন্ধু ভাবে বলে মনে হচ্ছে না। বড় গরম তারা।

বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই দুটো সারিডন, তারপর অন্য কথা।

পুরোনো ম্যানেজার রমাপতি বাবু সঙ্গে আসছিলেন, কিছুতেই একা ছাড়লেন না। বললেন, 'না, দিনকাল ভালো নয়, ছেলে ছোকরারা যেন কেমন হয়ে গেছে। চলুন আমি সঙ্গে যাই।'

সামনের আসন থেকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'স্যার, বাড়ি গিয়ে একটু গরম জলে পা ডুবোবেন দেখবেন অনেক আরাম হবে। সারাদিন খাটছেন, চিন্তা ভাবনা করছেন—'

যজ্ঞেশ্বর মল্লিক বললেন, 'আপনাদের মতো মানুষ যার সহকর্মী সহযোগী তার আর চিন্তা ভাবনা কী। আমার বরং ফিরে গিয়ে আপনার আর সন্তোষের জন্যই বেশী উদ্বেগ থাকবে।'

'আমাদের জন্যে ভাববেন না স্যার, আমরা এখানকার হালচাল এই ক'বছরে বেশ ভালো ভাবেই বুঝতে পেরেছি। কে কী ভাবে না ভাবে করে না করে সবই জানি। প্রত্যেকের দৃষ্টি আমাদের চেনা। একটা কথা স্যার—।'

'বলুন।'

'কিছু ঝাড়াই বাছাই করা দরকার।'

'মানে ছাটাই?'

'দশটা ভালো লোকে মিলে যা করতে পারে না, একজন

কুবুদ্ধিদাতা একাই তা পারে। মিথ্যা প্রবঞ্চনা ইত্যাদিতে পটু থাকলে, এইসব জায়গায় লোক ক্ষ্যাপাতে তো খুব বেশী চেষ্টা করতে হয় না? আপনি এ বিষয়ে ভাবুন সেটাই আমার অনুরোধ।'

'না না তা হয় না।'

'উপায় কী?'

'না রমাপতিবাবু সেটা ঠিক হবে না। একটু বুঝোলে সুঝোলেই এরা দেখবেন আর কোনো গোলমাল করবে না। আমি ভালো করে বুঝিয়ে বলেওছি। আসলে কি জানেন, মিস আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং। ভুল বোঝাবুঝি। আমি দেখেছি সব অনর্থের কারণই এই ভুল বোঝাবুঝি।'

এখানে বিদ্যুতের আলো নেই চারদিক গহন অন্ধকার, জঙ্গলে যারাই গেছেন তারাই জানেন, ভিতর থেকে কী এক ধরণের পোকার ডাক ওঠে, রাত দশটায় সেই ডাক তীব্রতর হয়েছে। যজ্ঞেশ্বরের গাড়ি ফটকে ঢুকলো। ঢুকতেই অনেকগুলো বসে থাকা লোক উঠে দাঁড়ালো। অন্ধকারে তাদের ঠিক ঠাহর হচ্ছিলো না, উঠে দাঁড়াবার পরে মনে হলো একটা কালো ঝোপ যেন সহসা একযোগে উঁচু হয়ে উঠলো।

যজ্ঞেশ্বর বললেন, 'কে ওরা? এতো রাতে কী করছে ওখানে?

লম্বা কালো ঝোপ ছড়িয়ে পড়লো একেকটা কালো গাছের মতো। আলাদা আলাদা হয়ে এগিয়ে এলো গাড়ির কাছে।

'কে?'

'আজ্ঞে স্যার আমরা।'

'তোমরা? তোমরা কে?'

'আমরা কারখানার লোক।'

'এতো রাতে?'

'আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।'

'আমার জন্য। কী দরকার?'

'আপনি আমাদের উপর যে যে উপদেশ নোটিশ করে টাঙিয়ে দিয়েছেন, সে নোটিশটি উইদ্‌ড্র করতে হবে।'

'মানে?'

'মানে সবিনয়ে আপনাকে জানাতে চাই, আমরা কারো ক্রীতদাস নই যে হুকুম মাত্রই তা পালন করবো।'

যজ্ঞেশ্বর গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমিও তোমাদের নির্বোধ নই যে, তোমাদের স্বেচ্ছাচারিতাকে নির্বিচারে প্রশ্রয় দেব?'

'না, বিচার আচার তো সবই আপনার হাতে, যে হেতু এখানে আপনিই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তবে চিরকাল যা চলে এসেছে, এখন আর তা চালানো যাবে কি?'

আকাশের আলোয় চোখ তুলে তাকিয়ে ছেলেটিকে দেখলেন যজ্ঞেশ্বর। এই ছেলেটির কথাই সন্তোষ মণ্ডল লিখেছিলো। ছেলেটির চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপ, ভালো লাগলো। যখন নিয়োগ করেছিলেন তখনো এই ভালোলাগাই কাজ করেছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'হুঁ, বুঝেছি। কিন্তু আজ কোনো কথা নয়, আজ আমার শরীর ভালো নেই, আমি ক্লান্ত।'

'ক্লান্ত স্যার আমরাও। সারাদিন না খেটে আমরাও ঘরে ফিরি না। আর আজ তো ফিরিইনি।'

'ও।'

'সেই তখন থেকে বসে আছি শীতের মধ্যে।'

'খুব অন্যায় কাজ করেছ, এবার বাড়ি যাও।'

গাড়ি থেকে নেমে তিনি কাঠের সিঁড়িতে পা দিয়েছিলেন।

ছেলেটি বাধা দিল, 'বাড়ি তো নিশ্চয়ই যাবো, তার আগে এই ব্যাপারটার একটা ফয়সালা হয়ে যাওয়া ভালো নয় কি ?'

যজ্ঞেশ্বর থামকালেন। আবার সিঁড়ি উঠতে চেষ্টা করে বললেন, 'আজ আমি তোমাদের সঙ্গে কোনো কথা বলতে রাজী নই।'

আবার বাধাপ্রাপ্ত হলেন, 'রাজী আপনাকে হতেই হবে স্যার।'

'ও ; তা হলে দেখা যাচ্ছে তুমিই এক মন দুধের মধ্যে এক ফোঁটা চোনা ?'

'না স্যার, দুঃখিত। আপনার খাবার দুধ এখন সবই টকে গেছে। প্রত্যেকেই যার যার অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়।'

'সে তো একশোবার। কিন্তু অস্তিত্বের মূল্যটা কী ?'

'সে দেখুন সকলের অস্তিত্বের মূল্যই সমান। আপনারও যা আমাদেরও তাই।'

'আমার অস্তিত্বের মূল্য কাজ। তোমাদের ? বসে বসে মাইনে নেওয়া আর নিরীহ কতকগুলো লোককে হাতিয়ার করে দল বৃদ্ধি আর উদ্দেশ্য সিদ্ধি, তাই না ?'

'আত্মসম্মানে আঘাত দিয়ে কথা বলবেন না। সেটা আপনার পক্ষে সুবুদ্ধির পরিচয় হবে না। বেশী কথা বলতে চাই না, আমাদের যা দাবী সেটা মানতে হবে আপনাকে।'

যজ্ঞেশ্বর সবেগে ঘুরে দাঁড়ালেন, 'শোনো হে ছোকরা, এই ক' বছরে তোমাদের সব দাবীই আমি মেনে নিয়েছি। তোমরা তার যোগ্য বলে নয়, তোমাদের বিশ্বাস করা আমরা স্বভাব বলে। কিন্তু এখন দেখছি সেটাই আমার মস্ত ভুল হয়েছিলো। আর কোনো দাবী আমি মানতে রাজী নই।'

'না মানলে আমরা আপনাকে ঘরে ঢুকতে দেবো না।'

'কী করবে ?'

'সারা রাত এই বাইরে, এই মাঠের মধ্যে থাকতে হবে।'

''তাই নাকি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তোমরা ?'

'আমরা আপনার বাড়ির ভিতরেই ঘুমোবো ঠিক করেছি। অবশ্য দু' চারজনকে এই ঢাকা বারান্দায়ও বসে থাকতে হবে।'

'কেন ?'

'আপনাকে পাহারা দিতে হবে তো ?'

'যাতে ঘরের মধ্যে ঢুকতে না পারি ?'

'ঠিক তাই।'

'আমার বাড়িতে আমাকেই পাহারা দেবে ?'

'কী আর করা।'

'তাই দাও। দাঁড়ালেন সোজা হয়ে।'

এইবার ম্যানেজার রমাপতিবাবু ব্যাকুল ভাবে এগিয়ে এলেন, 'কী করছো তোমরা ? উনি আজ অসুস্থ, খুবই অসুস্থ—'

এই বলার সঙ্গে সঙ্গেই জনা তিনেক বয়স্ক দাবীদার লাফিয়ে উঠে বললো, 'না না, আপনি ঘরে যান বড়োবাবা—' বলে নিজেরাই ধরে বারান্দায় নিয়ে এসেছিলো, অমনি আরো কয়েকজন ঠেলে বাইরে নিয়ে গেলো।

'না, এটা ঠিক হচ্ছে না—' আবার বারান্দায় নিয়ে এলো তারা।

'যথেষ্ট ঠিক হচ্ছে।' অন্যরা আবার ঠেলে বাইরে আনলো।

আবার বারান্দা। আবার মাঠ। আবার বারান্দা। আবার মাঠ।

রমাপতি বাবু হাউমাউ করে কেঁদে একবার এর হাত ধরতে লাগলেন, একবার ওর পা ধরতে লাগলেন মনিবের জন্য তাঁর বুক ফেটে যেতে লাগলো। তাঁর পুরুষ গলার চাপা ক্রন্দনে নির্জন বনভূমি চকিত হয়ে উঠলো। কিন্তু মনিবের গলায় একটিই আওয়াজ 'যা খুশি করো। তোমাদের একটি দাবীও আমি আর মানবো না।'

ছয়

কেউ একজন রমাপতিবাবুকে হাত ধরে টেনে ঘরের মধ্যে এনে বসিয়ে দিল। তারপর যজ্ঞেশ্বরকে নিয়ে মাঠ বারান্দা, বারান্দা আর মাঠ করতে করতে নিজেরাই এক সময় থামলো। বারান্দায় ওঠাবার লোকেরা সংখ্যায় কম, মাঠে রাখার পক্ষপাতিরা বেশী। সুতরাং যজ্ঞেশ্বর মল্লিক মাঠের হিমেই শীতল হতে লাগলেন।

রাত বাড়তে লাগলো, শীত বাড়তে লাগলো, এক ফালি চাঁদ উঠলো আকাশে, তিনি একভাবেই শক্ত লোহা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। এক সময় তাকিয়ে দেখলেন, কাচ ঢাকা বারান্দায় তাস খেলছে চারজন, অন্যদের দেখা গেলো না, বোধহয় তাঁর বিছানায় শুয়ে ঘুমুতে গেছে।

যাক।

কখন যেন বসে পড়লেন। ভীষণ শীতে থরথর করলো শরীর। সহজেই কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে অনেকগুলো স্বপ্ন দেখে ফেললেন।

প্রথমে একটি ছোট্ট ছেলেকে দেখলেন। তার নাম নেই, ধাম নেই, জাত নেই, গোত্র নেই, কিচ্ছু নেই। তার বয়েস কতো তা-ও তিনি জানেন না। তার সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয়েছিল ঠিক এই রকমই এক রাত্রিবেলা, একটা গলির মধ্যে। পথ হারিয়ে সে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছিলো। মাকে খুঁজছিলো। পরনে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা কোনো বড়ো ছেলের একটা

ছেঁড়া পুরোনো ইজের, হাতে একটা মগ। সেটাও এমনিই শীতের রাত ছিল, বিকেলে মা একটা গামছা জড়িয়ে বেঁধে দিয়েছিলো গলায় সেটা মনে আছে।

এ-ও মনে আছে সকালে সে তার মায়ের বুকের দুধ খেয়েছিলো। যদিও বুকের দুধ খাবার মতো ছোটো সে ছিলো না, বেশ ঘুরে ফিরে বেড়াবার মতো লায়েক হয়ে গিয়েছিলো, মুখভর্তি পোকায় খাওয়া দাঁতের বেশ কয়েকটা পড়ে গিয়ে আবার উঠি উঠি করছিলো, সেই দাঁত দিয়েই মায়ের শুকনো বুকটা সুযোগ পেলেই ছিঁড়ে খাওয়া তার অভ্যেস ছিলো। সকালে আর রাত্তিরে তো নিশ্চয়ই।

অবশ্য মায়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় ঐ সকালে আর রাত্তিরেই। বাদ বাকি সময় ফুটপাতের পাশে একটা গাছের ছায়ায় ছেঁড়া বস্তা পেতে বসিয়ে দিয়ে মা কোথায় কোথায় চলে যেতো ভিক্ষে করতে, তাকেও বলে যেতো ঐখানে বসে বসেই বাবুদের কাছে পয়সা চাইতে। বলতো হাত পেতে থাকিস, দিলে দেবে। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো সে, মায়ের চোখের কোলে জল চিকচিক করতো। আর তখন তারও কান্না পেয়ে যেতো। হঠাৎ আবদার ধরতো সঙ্গে যাবার জন্য। মা বুঝিয়ে বলতেন, ঐ কচি পায়ে সে অত হাঁটতে পারবে না দোরে দোরে। যেদিন বেশী বায়না করতো সেদিন মা ফিরে আসতো দুপুরে, আর বেরুতো না।

যাবার আগে খাবার কিনে দিয়ে যেতো আর বলতো কক্ষনো কিন্তু বড়ো রাস্তায় নেমোনা, কেউ ডাকলে জায়গা ছেড়োনা, বাবুদের কাছ থেকে যে সব পয়সা পাবে অমুক জায়গায় লুকিয়ে রেখো আর বৃষ্টি পড়লে অমুক গাড়ি বারান্দার তলায় গিয়ে বসে থেকো। বাধ্য ছেলের মতো মাথা বাঁকাতো সে। কিন্তু মা চোখের আড়াল হতে না হতেই

এক ছুটে ফুটপাতের এই প্রান্তর থেকে ঐ প্রান্তর পর্যন্ত দৌড় লাগাতো। এটা খেলা। দৌড়োদৌড়ি করে কতো কতো দূরে চলে যেতো। অন্য অন্য ভিখিরি বাচ্চারাও সঙ্গী হতো। আর বৃষ্টি নামলে তো কথাই নেই। ভিজে ভিজে খেলা করবার মতো সুখ আর কোথায়। বিকেলে মা ফিরে আসার আগেই জায়গায় এসে একেবারে ফিটফাট লক্ষ্মীছেলে। ঝাঁপিয়ে পড়তো মায়ের গায়ে, মা আদর করতো, চুমু খেতো বলতো আমার মাণিক, আমার সোনা। তারপর পুঁটুলি বার করে কোথা থেকে চেয়ে চিন্তে আনা অনেক রকম মিশেল খাবার দিয়ে কাঠ কুটো জ্বালিয়ে ভাত রাঁধতে বসে যেতো।

কতো শুকনো আলুর খোসা কুমড়োর খোসা যে মা কুড়িয়ে আনতো। ঠিক নেই, আবার দুটো একটা আস্তো সবজিও থাকতো। তাই দিয়েই এক ছিঁটে তেলে ভাজা ভাজা করে দারুণ সুন্দর তরকারী রান্না হতো, তারপর ভোজ। খেতে খেতে মা বলতো কোথাকার জল কোথায় গড়ালো। এসব কথার কোনো অর্থ তার বোধগম্য হতো না। থেমে থেমে মা আবার বলতো, 'ঘরের বৌ পথের ভিখিরি। কী হলো।'

খেতে খেতেই ঘুম পেতো তার, মা সব কাজ সেরে গাড়ি বারান্দার তলায় গিয়ে শুতো তাকে নিয়ে। তখনই সে, অতবড়ো ছেলে, টেনে টেনে দুধ খেতো। মা খুব ভালোবাসতো তাকে। অন্যান্য ভিখিরি মায়েদের মতো বকতো না মারতো না, কেবল ঘাট ঘাট করতো। কেবল বলতো, কেন এমন হলো, কেন এমন হলো।

কিন্তু সেই রাত্তিরে সেই শিশু হারিয়ে গেল। রাত গভীর হয়ে গিয়েছিলো মাকে খুঁজতে খুঁজতে। সেই রাত্রে ঠিক রাত্রে নয়, সন্ধ্যায় মা যেন কোথায় গেল, আর তখুনি সে কার কাছে একটা বিয়ে বাড়ির

সন্ধান পেয়ে কার সঙ্গে খাবার লোভে অনেক দূরে চলে গিয়ে আর ফিরতে পারলো না। খুব খেয়েছিলো। খুরি ভর্তি ভর্তি পাতের খাবার ওরা ফেলে দিচ্ছিলো ডাস্টবিনে, আর সে অন্য ভিখিরিদের আর কুকুরদের সঙ্গে হামলে পড়ে তুলে নিচ্ছিলো সব। পেটটা এই ফুলে ঢাক হলো খেতে খেতে। মনটা খুব ভালো লাগছিলো। তেমন খাবার সে জীবনে খায়নি। স্বাদ লেগেছিলো জিবের মধ্যে। তারপর রাস্তার কলে জল খেয়ে ফিরতে গিয়ে দেখলো পথ চেনে না।

সম্পূর্ণ—উল্টোপথ ধরে মা মা বলে কাঁদছিলো। শরীরটা, বেশী-রাত্তিরের শীতে এমনই কেঁপে কেঁপে উঠছিলো, আর এ পথ ছেড়ে সে পথ, সে পথ ছেড়ে ও পথে, এমনি বারান্দা আর মাঠ, মাঠ আর বারান্দার মতো ঘুরপাক খাচ্ছিলো। কিন্তু ঠিক রাস্তাটা আর কোন রকমেই চিনে উঠতে পারলো না।

শুধু তো মায়ের জন্যই নয়, ঐ গাছ তলাটার জন্য, ঐ গাড়ি-বারান্দাটার জন্য, মায়ের বুকের দুধ খেতে খেতে কাঁথার তলায় ঘুমোবার জন্য তার কান্না আর থামতে চাইছিলো না।

মা যে তাকে নিয়ে কবে সেখানে বাসা বেঁধেছিলো, কোথাকার জল সত্যি কোথায় গড়িয়ে যে সেখানে গিয়ে থেমে ছিলো তা সে জানে না, স্মৃতি যতোদূর যায় ঐ টুকুই তার মনে রাখার প্রথম অংশ।

রাত্রিবেলা লোভ করতে গিয়েই সে পথ হারালো। সেই রাত্রের সেই ভয় এবং মায়ের জন্য শোক ভুলে যাবার কথা নয়। তাই সেই রাত্রিতেই সেই ছেলে নিজেকে নিজে প্রথম দেখেছিলো। ভয় দুঃখ অসহায়তা—আরো কতো বেদনার কতো অনুভূতি যে সেদিন তাকে কষ্ট দিয়েছিলো তার হিসেব সে জানে না। ভাবলে আজও সেই মা-

হারা পথহারা ভিক্ষুক শিশুটির জন্য তার দুঃখের অবধি থাকে না। কান্না পায়। আজও। হ্যাঁ আজও।

শেষে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলো, শিশুর চোখের পাতা ঘুমের ঘোরে ভারি হয়ে উঠেছিল। একটা বুড়োমতো নেড়া মাথা লুঙ্গি পরা লোক এসে দাঁড়ালো। আদর করে বললো, 'কাঁদছিল কেন?' শিশু বললো, 'মার কাছে যাবো।' 'ও, মার কাছে যাবি? তা চল, আমি এক্ষুনি নিয়ে যাচ্ছি তোকে।'

'তুমি আমার মাকে চেনো?'

'হ্যাঁ, কেন চিনবো না?'

অমনি ঘুম ভুলে কচিহাতে সেই লোকটার হাত ধরলো শিশু। তারপরে লোকটা যে কতদূর কোথায় নিয়ে গেল তাকে কে জানে। মার কাছে নয়, একটা জলো জলামতো জায়গায়, অন্ধকারে একটা কুঁড়ে বাড়ির মধ্যে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল। সেখানে আরো অনেক গুলো ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে গাদাগাদি করে শুয়েছিল।

পরের দিন সকালে পাঁচটার ঘুম ভাঙিয়ে লোকটা জিজ্ঞেস করেছিলো; 'এই তোর নাম কি রে?'

সে বলেছিলো, 'জানি না।'

'নিজের নাম নিজে জানিস না?' মারবো এক গাট্টা।' মারলোও। ওর আঙুলের শক্ত গাঁট তার কচি মাথার মধ্যে বসে গেল। গলগলিয়ে জল বেরিয়ে এলো চোখে, তবু বলতে পারলো না কী নাম। পা দিয়ে ঠেললো, 'তখন বললি যে তোর মার কাছে যাবি, মিথ্যে কথা, না?'

সে ফুঁপিয়ে বললে, 'মার কাছে যাবো?

'ব্যাটা নাম বল আগে, তবে তো মা। মা তোকে কী বলে ডাকে?' তখন সে বললো, 'মা আমাকে জগু জগু বলে ডাকে।'

'ও বাবা, একেবারে যজ্ঞ থেকে উঠে এসেছিস? দ্রৌপদীর মাসতুতো ভাই। বাঃ বাঃ—বাছা জগু, এবার ওঠোতো ধন, মুখ ধোও, তারপর দয়া করে চলো মার কাছে নিয়ে যাই।'

জগু লাফিয়ে উঠেছিলো, তারপর অন্য ছেলেমেয়ে গুলোর সঙ্গে রাত্রে যেমন গাদাগাদি করে শুয়েছিলো, ততোধিক গাদাগাদি করে একটা বন্ধ ঘোড়ার গাড়িতে চেপে মনে অশেষ আশা নিয়ে রওনা হয়েছিলো মার কাছে যাবে বলে।

সে আশা তার পূরণ হয়নি। চলতে চলতে গাড়ির দরজা খুলে মাঝে মাঝেই কয়েকজনকে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। সঙ্গে সব সময়েই লোকটা নিজে নামছিলো, আবার ফিরে আসছিলো খানিক বাদে।

একটা জায়গায় দলের সঙ্গে জগুকেও নামালো। বসিয়ে দিলো একটা বাজারের মধ্যে। শাসিয়ে দিল ভালো করে ভিক্ষা করতে না পারলে বাড়ি নিয়ে গিয়ে ফাঁসি লটকাবে। সেই থেকে সব দাঁত পড়ে সব দাঁত না ওঠা পর্যন্ত জগু সেখানেই ছিলো। সেই দলের মধ্যে কেটেছিলো তার রঙিন শৈশব।

প্রতিদিন ভোর না হতে ঐ অন্ধ গাড়ির মধ্যে গাদাগাদি করে সকলকে নিয়ে বেরিয়ে নানা জায়গায় নানা পাড়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসিয়ে দিয়ে যেতো ভিক্ষার জন্য, আবার সন্ধ্যায় তুলে নিয়ে যেতো। খবরদারি করার জন্য প্রত্যেক দলে একজন করে লোক থাকতো। গোয়েন্দা হয়ে লক্ষ্য রাখতো কে কী করছে না করছে দেখবার জন্য। বোধ হয় পালাতে না পারে সেজন্যও। তাছাড়া পয়সা চুরি করতেই বা বাধা কী? কত লোভনীয় খাবার ছড়ানো আছে চারদিকে, খরচ করে খেয়ে ফেলতে কতোক্ষণ?

সন্ধ্যায় ফিরলে সকলের সব উপার্জন বুঝে নিত লোকটা। যে বেশী পয়সা দিতে পারতো তাকে পেট ভরে রুটি খেতে দিত, যে পারতো না তাকে আধপেটা খাইয়ে শাস্তি দিত। আর চড়টা চাপরটা, সে তো নিয়ম। যখন তখন শিলা বৃষ্টির মতো গুমগাম পড়তো এসে পিঠে।

খুব নির্দয় লোক। এই শিশুদের জন্যই তার যতো ফুটুনি, যতো বাবু হয়ে থাকা আর বড়ো বড়ো মাছের মাথা খাওয়া, কিন্তু তাদের জন্য একটু মমতা নেই। মানুষ তো নয় বাচ্চাগুলো যেন কতকগুলো

কলকজা স্ক্রু বল্টুর মতো তার কাছে। একলা মাঠের সেই কুঁড়ে বাড়িটার ছবি কী ভয়াবহ!

ঐ মাঠের জোনাকী জ্বলা জঙ্গলের মধ্যে আরো কুঁড়ে ছিলো। একটাতে ঐ লোকটা নিজে থাকতো, দু'জন বৌ ছিলো সেখানে, তারা রোজ এমন ঝগড়া করতো যে কাকগুলো কা কা করে উড়ে যেতো। যখন গলার ঝগড়ায় কুলোতো না তখন দু'জন দুজনের চুল টেনে ছিঁড়ে দিত। একে অপরকে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষত বিক্ষত করে তুলতো। লোকটা থাকলে দু'জনকেই হাতের সুখে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করতো।

সেই স্ত্রী দু'জনও ভিক্ষেয় বেরুতো দিনের বেলা। গৃহস্থ বধূ সেজে বেরুতো। লালপাড় শাড়ি পরনে, হাতে শাঁখা, সিঁথি ভর্তি সিন্দুর ঘোমটার মুখে ঢাকা। একজন একটা পঙ্গু ছেলে নিয়ে বসে বসে কাঁদতো লোকদের দয়ার জন্য, আর একজন বাড়ি বাড়ি ঘুরতো বলতো স্বামীর যক্ষ্মা, বন্যায় সব ভেসে গেছে অথবা রিফিউজি, স্বামীকে মুসলমানরা কেটে ফেলেছে! আরো অনেক কিছু বলতো। সন্ধ্যাবেলা হাসাহাসি করতো তাই নিয়ে। মিথ্যা কথায় কে কতো পটু সেটা নিয়ে প্রতিযোগিতা হতো; যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের গালে টোকা দিয়ে বিশ্রি ভাষায় কিসব বলে আদর করতো লোকটা। সে নিজে বেরুতো রাত গভীর হলে।

আসলে ঐ দুজন ওর বৌ ছিলো না, অমনি ভাবেই বোধ হয় নিয়ে এসেছিলো কোথা থেকে। মাকে মনে পড়তো। জগুর মার মুখেও ঘোমটা থাকতো। মার বড়ো লজ্জা। মনে হয় মা বোধহয় সত্যি রিফিউজি ছিলো, স্বাধীনতার ঢেউ যাদের এক দেশের অট্টালিকা থেকে আর এক দেশের নর্দমায় এনে পৌঁছে দিয়েছে। সোনার সিংহাসন থেকে উচ্ছন্ন হয়ে যারা মলমূত্রের সগোত্র হয়েছে।

এদেশের সবাই বলে পূর্ববাংলা থেকে যারাই এসেছে তারাই বুঝি সব জমিদার ছিলো? সে দেশে বুঝি গরীব দুঃখী বলে কিছু ছিলো না? কেন বোঝে না, অর্থ বিত্তের দ্বারাই সকলে গরীব দুঃখীর উর্ধ্বে উঠতে পারে না, ওঠে আপন হৃদয়ের ঔদার্যে। না হয় গরীবই ছিলো, তাতে কি? তবু তো ঘর ছিলো, গৃহস্থালী ছিলো, স্বামী সন্তানের মধ্যে সব কিছুর পরে একটু শান্তি আর সম্মান ছিলো।

হয়তো জগুর মায়েরও ছিলো, কে জানে। ঘোমটা দিয়ে দোরে দোরে ভিক্ষা করা যে তার অভ্যাস ছিলো না, তখন সেই শিশুচোখে জগু কিছু না বুঝলেও বুদ্ধি দিয়ে পরে বুঝেছে। মা রাত্রে গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলতো, 'কেউ ছেলে নিয়ে লোক রাখতে চায় না, আমার সোনারে, কত আদরের তুই, এখন তুই-ই সকলের বোঝা।' তারপর সম্ভবত মা নিঃশব্দে কাঁদতো।

মার যতো দুঃখই থাক, তার তো ছিলো না। সে তো মাকে নিয়েই সমৃদ্ধ ছিলো। মা থাকলে আর শিশুর কী দরকার?

যদি এমন হয় পূর্ববাংলারই কোনো গরীব ঘরের বৌ ছিলো মা, জমিদার না হলেও তা কি এই ভিক্ষাবৃত্তির সমতুল্য? এই ফুটপাতের মতো ভয়ঙ্কর। স্বদেশ স্বজনের মধ্যে ভিক্ষা করলেও তার নিরাপত্তা থাকে। জন্মভূমিই মানুষের সবচেয়ে বড়ো রক্ষাকর্তা। পরিচিত পরিবেশ পরিজনের মতো। সেখান থেকে নির্মূল করে সেই মূলে কেউ যদি আর মাটি না দেয় বাঁচবে কী করে?

অবশ্য এই সব তার অনুমান। হয়তো তারা জন্মভিক্ষুক। হয়তো এই পেশায় তার মা-ই প্রথম নয়, মায়ের মা তার মা সবাই এই করেই খেয়েছে। কিন্তু যারা এই পেশাগত লোক তাদের তো দেখছে? মিল কোথায়? এই দু'জন মেয়েও তো ঘোমটা দিয়ে ভিক্ষে করে, মায়ের

সঙ্গে কি এরা তুলনীয়? ছি! ছি ছি! সেই সঙ্গে পুটুলির ভিতর একটি পোকায় কাটা ছবিও মনে পড়ে বই কি। ভাসতে ভাসতেও মা যেটি আঁকড়ে রেখেছিলেন। সে নাকি জগুর হারিয়ে যাওয়া বাবা।

মা বলতেন জগুর মুখে তার বাবার মুখটাই কেটে বসানো। হবে। কে জানে। ঐটুকু জগুর তখন তা নিয়ে চিন্তা করবার বয়েস ছিলো না। এর পরেই মা দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন, 'মল্লিক বাড়ির চেহারার একটাই ধরণ। মায়ের গলার কাটা কাটা টুকরো টুকরো এই সব কান্নাবিজড়িত শব্দ জগুর অনেক পরে মনে পড়েছে, যা শিশু হৃদয়ে সুপ্ত ছিলো। সেই মা তার কোন তরঙ্গে ডুবলো শেষে কে জানে।

সাত

সেই ছেলেটা যতোদিন ছোট ছিলো লোকটার হাতে মারধোর খেয়ে ভিক্ষে করে আর অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলো করে মাকে ভুলে থেকে, খেয়ে না খেয়ে সব শেষে ঘুমিয়ে এক রকম কাটিয়ে দিচ্ছিলো দিনগুলো। একটু বড় হতেই ঐ লোকটার দলেরই আর এক ধাপ বড়ো বয়সের ছেলেদের সঙ্গে মিশে কেমন এক ধরণের মিশ্র ভালোমন্দ ও বেদনা বোধে আক্রান্ত হলো।

সেই ছোট্ট ছেলেগুলো, যে গুলোর নাকের তলায় পাতলা পাতলা গোঁফ গজাচ্ছিলো, সেগুলো মেয়েদের দেখলেই কী সব ইঙ্গিত করতো, হি হি করে হেসে গড়িয়ে পড়তো, দুটো আঙ্গুল মুখে পুরে সিটি দিত। মারও খেতো এন্তার। যখন তখন যেখানে সেখানে। অবশ্য সাজা গোজা ভদ্রলোকের মেয়েদের দেখলে ও রকম করতো না, ভিখিরি দলের মেয়েদের উপরই ঐ সব চালাতো। কতোগুলো মেয়ে ভয় পেতো, তারা সব নতুন বড়ো হওয়া মেয়ে। আর যারা বেশ অনেক দিন

আগে বড়ো হয়েছে, তারা হাতের কাছে যা পেত তাই নিয়ে তেড়ে আসতো, চেঁচিয়ে রাস্তা ফাটিয়ে জমিয়ে দিত লোক, তারপর মার খাওয়াতো। তখনকার মতো শিক্ষা হলেও একটু পরেই সে শিক্ষা তারা ভুলে যেত। এর মধ্যে আবার কোনো না কোনো ছেলে মেয়েতে ঐ করতে করতে ভাবও হয়ে যেতো। বালক ভিক্ষুকরা তখন কিশোর ভিক্ষুকদের নানা রকম ক্রিয়াকলাপ দেখে রোমাঞ্চিত হতো, শিখেও ফেলতো অনেক কিছু।

এরা সবাই তাদের দলের ছেলে। বিভিন্ন বয়সের ছেলে মেয়ে নিয়েই লোকটার কারবার। ঐ জলাভূমিতেই ছোটো ছোটো পাতার কুটিরে ভিন্ন ভিন্ন পেশার ভিন্ন ভিন্ন বয়সের ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রী পুরুষের অবস্থান। এই সময়েই জগুর জীবনটা বড়ো অসহনীয় হয়ে উঠেছিলো। পাখি যেমন শিকল কাটবার জন্য আঁকুপাঁকু করে তার মনটা তেমনি করতো। কিন্তু উপায় ছিলো না, সব সময়েই সতর্ক প্রহরীদের চোখ সজাগ।

নিয়ের বয়সের অঙ্কটা নিজের জানা থাকলেও লোকটা বলতো, 'ন্যাকা। দশ বারো বছরের ছেলে আর তুমি এটা বোঝে না? মারবো এক গাট্টা।' এই বলে প্রচণ্ড জোরে এমন মারতো, যেন খেলা?

দশ বারো বছরই হবে তখন, কেননা, ওখানে ঐ লোকটার সঙ্গে যে স্ত্রীলোক দুজন থাকতো, তাদের একজনের একটা ছেলে ছিলো, তার বয়েস বারো, সে ঠিক তার মাথায় মাথায়। সেই দশ বারো বছরের জীবনে ঐ ছোট্টো ছেলেগুলো তাকে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছিলো। তারা যখন মেয়েদের সঙ্গে ঐ সব অসভ্যতা করতো, খুব কৌতূহল হতো তার। একটা উত্তেজনা হতো। সে কেবল তাকে তাকে থাকতো ওরা অবসর সময়ে কে কখন কোথায় যায় কোথায় থাকে কী

করে এই সব দেখবার জন্য। বড় হয়ে ওঠা মেয়েগুলোর মধ্যেই যে পৃথিবীর চরমতম রহস্যের সন্ধান লুকায়িত আছে একথা ভেবে বোঝা না বোঝা এক অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত হতো।

আস্তে আস্তে সে-ও একদিন ঢ্যাঙা হয়ে উঠলো নানা রকম শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে ভারি অবাক হলো সে। সেই সঙ্গে এ-ও আবিস্কার করলো অনেক অজানা তথ্য তার জানা হয়ে গেছে, অজানা অনুভব স্পন্দিত হচ্ছে দেহের অভ্যন্তরে। কিন্তু ঢ্যাঙাদের মতো কোনো অসভ্য আচরণে তার আবৃত্তি হলো না, বরং ঘৃণা তাকে ক্ষুব্ধ করলো।

যদিও ভিক্ষাবৃত্তিই তার পেশা, দলপতির মর্জির উপরে পেট ভরে খেতে পাওয়া না পাওয়া নির্ভর করে তবু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে স্বাস্থ্যের ঢল নামলো। বড়ো মেয়েরা গাল টিপে দিয়ে বলতো, 'আ মোলো যা, এ দেখছি দিব্যি ডাগর ডোগর এক নাগর হয়ে উঠছে।'

এরপর তারা অশ্রাব্য কুশ্রাব্য কথা বলে ঠাট্টা তামাসা করতো তার সঙ্গে। তার কান লাল হয়ে উঠতো। সে পালাবার পথ পেতো না।

ঐ স্বাস্থ্যের জন্যই একদিন লোকটা বললো, 'শোন, যা তেল করেছিস শরীরে তাতে আর তোকে ভিক্ষা মানায় না। কাল থেকে বিমলে ছিনতাইয়ের হাতে খড়ি দেবো। মন দিয়ে কাজ করবি বুঝলি?

কোনো একটা বিশ্রি পল্লীতে নিয়ে গিয়ে এই শিক্ষা চলছিলো, দলে তারা তেরোজন ছিলো। দেখতে দেখতে হাত সাফাইয়ের কাজে দেশ দক্ষ হয়ে উঠলো। লোকটা পান খাওয়া লাল দাঁতে তারিফ করলো খুব। সেই সময়ে জীবনটা একটু স্বাধীন স্বাধীন মনে হতো।

একটা হাত খরচ দিত বলে বেশ চাকরি চাকরিও লাগতো। লোকটা বলেছিলো, 'এই কাজে দেখছি খুব বুদ্ধি খেলে তোর, আর একটু পাকা হ আর একটু বড়ো হ, মার পিট্টিতে আর একটু অভ্যাস হোক, চোরাই মালের দোকান দেবো একটা তোকে নিয়ে। কিন্তু মনে রাখিস, দল ছাড়লে বা কাউকে বলে দিলে বা পালালে একেবারে জ্যান্ত পুতে ফেলবো।'

তা পারে লোকটা। প্রয়োজন মতো কারো ঠিকানা মুছে ফেলা ওর একটা পিঁপড়ে টিপে মেরে ফেলার মতো সহজ। সবাই বলে ঐ জলার মধ্যে অনেক মানুষের বিদেহী আত্মা ঘুর পাক খায়। কেউ কেউ নাকি দেখেওছে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড। তবে মারতে মারতে মেরে ফেলে অম্লান বদনে যে ভাত খেতে বসেছে তা জগুও দেখেছে। সেবার একটা ছোটো ছেলে, ভিক্ষের পয়সা লুকিয়ে রেখেছিলো, বলেই বেদম প্রহারে তার মৃত্যু ঘটে।

তবু এই ছিনতাইয়ের কাজে এসেই জগু একদিন পালালো। এই তার দ্বিতীয়বার পলায়ন। ছোটো বেলায় ও আস্তানা ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিলো অনেক দূর। ভয় পেয়ে আবার নিজেই ফিরে এসেছিলো। এইবার ধরা পড়লো। পথ চেনে না বলেই ধরা পড়েছিলো। সব সময় বন্ধ গাড়িতে গিয়ে গিয়ে একেকদিন একেক জায়গায় ছেড়ে দিয়ে আসতো বলে শহরের সব রাস্তাই একাকার ছিলো চোখে। ছিনতাইয়ের পথও অজানা। ওরাই এনে জায়গা মতো দাঁড় করিয়ে দিত।

ধরে ফেলে বারো বছরের ছেলেকে ন্যাংটো করে গাছে বেঁধে সকলের সামনে চাবকাতে চাবকাতে অজ্ঞান করে ফেললো। গায়ের ঘা সাতদিনেও শুকোলো না। বাইরে ফেলে রেখেছিলো দুদিন। যতোদূর চোখ চলে ধূ ধূ মাঠ জঙ্গল আর জলাভূমি। এখানে ওখানে

কয়েকটা পাতার কুটির। সবই ঐ লোকটার। মেয়েরা মেয়েদের ঘরে থাকতো, ছেলেরা ছেলেদের ঘরে। মেয়েদের পাহারা দিতো ঐ মেয়ে মানুষ দুটি। ছেলেদের পাহারা দিতো ষণ্ডাগুণ্ডার মতো দেখতে তিনটে লোক। পালা করে করে থাকতো তারা।

মার খেয়ে পড়ে থাকতে থাকতে সেই বালকের বুকে সহস্র হাতির বল সঞ্চিত হলো, মনে অসাধারণ শক্তি বেগ দুর্মর হলো। মৃত্যুর কাছাকাছি গিয়ে, মৃত্যুতে আর ভয় রইলো না। শেষে গায়ের ঘা না শুকোতেই, শয্যাশায়ী থাকতে থাকতেই কোনো দুপুরের নির্জনে সে আবার পালালো। এবার খুব বুদ্ধি করে পালালো। নিজের বিছানায় একটা লম্বা কিছুকে চাদর চাপা দিয়ে এমনভাবে রাখলো, মনে হলো সেই শুয়ে আছে। তারপর ঝোপে ঝোপে গা ঢেকে ঢেকে পা টিপে টিপে চলে এলো জলার বাইরে তারপর দৌড় দৌড় দৌড়।

সেই চলাই চলা। আর কেউ ধরতে পারলো না। সূর্য অস্ত গেল, আঁধার ঘনিয়ে এলো, সহসা বৃষ্টি নামলো ঝম ঝম করে। সে থামলো না। দৌড়তে দৌড়তে এক সময়ে তাকিয়ে দেখলো সামনেই কতকগুলো টিনের সেড, ঢুকে গেল তার মধ্যে। তারপর তিনদিন বেহুঁস।

আট

সব মানুষই অমানুষ নয়। সেই টিনের সেডের বস্তা বস্তা পর্বত পরিমাণ মালের কোণে অচৈতন্য বালকটিকে আবিস্কার করে যে বুড়ো মানুষটি 'আহারে বাছারে কেরে তুই' বলে বুকে তুলে তার নিজের জায়গায় নিয়ে গিয়ে শুশ্রূষা করে ভালো করে তুলেছিলেন। তিনি একজন নাবিক। যেখানটায় সে পড়েছিলো সেটা খিদিরপুর ডক।

একটি জাহাজ এসেছে সেই ডকে, অহোরাত্রি আলো জ্বলছে, মাল নামানো হচ্ছে, খালাসীরা হিমসিম খাচ্ছে, নীল পোষাক নাবিকরা কতোকাল বাদে মাটির গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে ছুটেছে শহরের দিকে, এই হৈ হুল্লোরের মধ্যে সে চোখ তাকিয়ে সেই পাকাচুলের নাবিকটিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভাবলো স্বপ্ন। গলায় একটি অস্ফুট শব্দ উত্থিত হয়েছিলো, 'জল।' সেই শব্দেই লোকটি ফিরে তাকালো, তাড়াতাড়ি জল দিল মুখে, সাগ্রহে বললো, 'এই তো জ্ঞান হয়েছে।'

কী বিচিত্র জীবন। কী বিচিত্র নিয়তি। ঐ নাবিকই শেষে ঐ বালকের কর্ণধার হয়ে হাল ধরলেন। যেন নরক থেকে হাত ধরে বার করে নিয়ে এসে স্বর্গদ্বারে পৌঁছে দিলেন। সব শুনে খালাসী করে ঢুকিয়ে নিয়েছিলেন, তারপরে—তারপরে—'ওহে নির্বোধ শ্রমিক পাণ্ডা শোনো, মন দিয়ে শোনো, তারপরে সেইখান থেকে এইখানে উঠতে আমি কী করেছি আর না করেছি শোনো। অবিরত অবিশ্রান্ত অক্লান্ত ভাবে কতো বড়ো এক পাথরের দরজা ঠেলে ঠেলে আপন অস্তিত্বকে এই সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছি শোনো। না, ফাঁকি দিয়ে স্বর্গলাভ হয় না।'

দুঃখের তোমরা কি জানো। কষ্টের তোমরা কী জানো। অনাহার অনিদ্রা বিপদ আপদ দুঃসাহস, দুর্বিপাক—এসবেরই বা তোমরা কি জানো? অন্তত আমার এই কারখানার লোকেরা তোমরা তার কিছুই জানো না। আমি তোমাদের সুখে রেখেছি শান্তিতে রেখেছি, লাভের বড়ো অঙ্কটা তোমাদেরই জন্য গচ্ছিত থাকে আমার কাছে। অপরাধের মধ্যে আমিও তার দ্বারা সুখে থাকি। থাকবো না? যদি নাই থাকবো তাহলে কিসের জন্য তিল তিল করে পরিশ্রমের প্রতিটি স্বেদবিন্দু দিয়ে

এই শিবির নির্মাণ? আমার কি কিছুই প্রাপ্য নেই? শুধুই কাঠ? তোমরাও কি সুখের প্রত্যাশী নও?

সেই নাবিককে আমি বাবা বলতাম, নাবিকও আমাকে পুত্রের অধিক স্নেহ করতেন। সেই পিতাকে আমি কী ভাবে হারালাম। মাস্তুলের উপর থেকে তিনি প্রায় সাতচল্লিশ ফুট নিচে ডেকে পড়ে গিয়েছিলেন। সেই অপমৃত্যু সহ্য করা আমার পক্ষে যে কতো বেদনার কতো শোকের সে কথা তোমরা বুঝবে না। তোমরা পিতা, কাকে বলে জাননা, তোমরা ভক্তি কাকে বলে জাননা, মাননীয়কে তোমরা মান্য করতে শেখোনি, ভক্তিভাজনকে ভক্তি করতে শেখোনি, তোমরা যা শিখেছ তা এক আধিভৌতিক অবজ্ঞা উপহাস আর স্বার্থপর ইচ্ছার দাসত্ব। কিছু না করে কিছু না দিয়ে সব কিছু কেড়ে নেওয়ার এক অপূর্ব-দীক্ষা। আহা, কে সেই প্রভু, যিনি শুধু কতোগুলো বুলিই গিলিয়ে দিয়েছেন তোমাদের, হজম করবার শক্তি কতোটুকু সে খবর না রেখে।

আমার নাবিক পিতা আমাকে কাজ শিখিয়েছিলেন, কথা বলে সময় নষ্ট করতে শেখাননি। আমার উন্নতির প্রতিটি ধাপ তৈরী করে দিয়ে বলেছিলেন, এবার আপন শক্তিতে উপরে ওঠো। ভিক্ষা করে উঠো না, যোগ্যতার বিনিময় কোরো। সেই উপদেশ হৃদয়ে রেখে আমি মিস্ত্রিদের সঙ্গে জাহাজ মেরামতের কাজ শিখেছি, খালাসী হয়ে আগুন ঠেলেছি, মাল তুলেছি, নাবিক হয়ে ইঞ্জিন চালানোয় দক্ষ হয়েছি, স্টুয়ার্ড হয়ে তত্ত্বাবধান করেছি, দশ বছর জলের বুকে ভেসে ভেসে জাহাজের পোকা হয়ে আমি কী না করেছি? আমার নবজন্ম দাতা পিতা আমাকে যে কর্মের দীক্ষা দিয়েছিলেন তা আমি একবিন্দু অপচয় করিনি।

নয়

এই কথাগুলো যজ্ঞেশ্বর মল্লিক চিৎকার করে বলতে চাইলেন, পারলেন না। বোধহয় ঠাণ্ডায় তাঁর গলা বসে গিয়ে থাকবে। শুধু একটা ফ্যাঁস ফ্যাঁস আওয়াজ বেরুলো, বুকের ভিতর যেন হাওয়া কমে গেল। তখন মন তার নিঃশব্দ সঞ্চারে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে পরিভ্রমণ করতে লাগলো। মাঠ ঘাট নদী নালা পথ প্রান্তর পর্বত প্রস্রবণ—কতো দ্বীপের কতো রূপ, কতো দেশের কতো চরিত্র।

একবার এক অজানা দ্বীপে পথ হাঁটছিলেন। মাইলের পর মাইল কোনো জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। কেবল চাষের ক্ষেত। অনেক দূরে নদীর ধারে বাড়ি দেখা গেল একটি। মাটির কুড়ে বাড়ি। দেয়ালে সব হাতে আঁকা ছবি; মাঝে মাঝে তীর ধনুক আর পাখির পালক দিয়ে সাজানো। এতো ভালো লাগলো। বসে পড়লেন দাওয়ায়। ভেতর থেকে স্ত্রীপুরুষ শিশু এসে ভিড় করে দাঁড়ালো। তাদের গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম, গালের হাড় উঁচু, নাক চ্যাপটাও নয় চোখাও নয়। চুল ঘন আর কালো,-চোখে বনের মদিরতা, মুখে লাবণ্য মাখামাখি। নিজস্ব ভাষা অন্য রকম। একজন পুরুষ ভাষা ভাষা ইংরিজিতে বললো, 'কে তুমি?' যজ্ঞেশ্বর বললেন, 'ইণ্ডিয়ান।'

'ইনদিয়া, ইনদিয়া, অতিথি, অতিথি' তার পরেই সাদরে গ্রহণ করলো তাঁকে। দৌড়ে ঘরের ভিতর গিয়ে একটা ব্রোচ নিয়ে এসে আটকে দিল বুকে। বললো, 'বন্দু, বন্দু। আমরা অতিথি ফেরাই না। ঘরে এস।'

শিশুর মতো সরল সব মানুষ। সামনে পাহাড়ের সারি, মাটির রং কালো, চারদিকে সোনালী গমের ক্ষেত, আর কী ভয়ানক বাতাস,

যাকে বলে বায়ু প্রবাহ। সারাক্ষণ বইছে, উড়িয়ে নিচ্ছে, দাঁড়ানো যায় না, চলতে অসুবিধা হয়। সার বেঁধে তাই পপলার গাছ বুনে দিয়েছে বাতাস ঠেকাবার জন্য। বোধ হয় ওটা ওদের হেমন্ত কাল, গাছের পাতা হলুদ আর লাল, বিছিয়ে আছে পথে গালিচার মতো।

নাবিক বাবা বলেছিলেন, এটা এ্যালাবার্টা অঞ্চল, ওরা রেড-ইণ্ডিয়ান। এই বাবাই ক্ষুণ্ণ থেকে আদর করে যজ্ঞেশ্বর বলে ডাকতেন। মল্লিক পদবীটা তিনি নিজে নিয়েছেন। মা যে বলেছিলেন, 'মল্লিক বাড়ির চেহারার একটাই ধরণ' সে কথাটা মনে রেখেই এই পদবী ধারণ।

আর একবার আর একটা দ্বীপে চারদিকে গভীর অরণ্য, ঘিরে ঘিরে পাহাড় চলেছে, ভয়ের মতো ভীষণ তার অন্ধকার রূপ। একদিন এই অচেনা অজানা রাজ্যে ঘুরতে ঘুরতে রাত হয়ে গেল। দূরে আগুন জ্বলছিলো দাউ দাউ করে, দেখা গেল দল বেঁধে নাচছে সবাই। ছেলেরাও মেয়েরাও। তারা একান্তই প্রকৃতির শিশু, কাপড় পড়তে শেখেনি। প্রচণ্ড জোরে ঢাক বাজছে, তালে তালে উত্তাল হয়ে এমন নাচ নাচছে যেন কোন জ্ঞান নেই। মাঝখানে গর্ত, তাতেই আগুন জ্বলছে, এদিকে মেয়েরা ওদিকে ছেলেরা। হঠাৎ ঢাক থামলো কেউ চেঁচিয়ে উঠলো, 'হেয়ারি ফ্রগ, হেয়ারি ফ্রগ' 'ফ্লাইং মাইস 'ফ্লাইং মাইস।'

আসলে ভোর হয়ে এসেছে, পশু প্রাণীরা জেগে উঠেছে, বিচিত্র বর্ণের বাদুড়েরা উড়াল দিল, হরেক রকমের বাদর লাফ দিল ডাল থেকে ডালে, সেই সঙ্গে লোমওলা ব্যাং আর উড়ন্ত ইঁদুর।

আফ্রিকার জঙ্গল। জাহাজ সেই দ্বীপে কোন কারণে আটকে ছিলো সাতদিন। সেই সাতদিনে বন্ধু হয়ে গিয়েছিলো এই

দ্বীপবাসীরা। তাদের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় কোথায় না গেছেন। ঘন-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সরু পথচলা রাস্তায় যেতে যেতে কোমর পর্যন্ত ঘাস বন ছাড়িয়ে নদীতে জলহস্তীকে সাঁতার কাটতে দেখেছেন, যে অরণ্যে সূর্যের আলো প্রবেশ করে না, যেখানে যেতে হলে ওরাও সার বেঁধে চলে দু'পাশে দুই তীরন্দাজ নিয়ে, চলতে চলতে যেখানে যে কোন মুহূর্তে বন্য জন্তুর মুখোমুখি পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে বলে মাঝে মাঝেই বড়ো গাছের ডালে সিঁড়ি ঝোলে, বিপদ বুঝলেই যাতে ঐ সিঁড়ি বেয়ে উঁচু গাছে উঠে বসে আত্মরক্ষা করতে পারে, সেই ভয়ঙ্কর জঙ্গল তিনি চষে বেড়িয়েছেন। আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে সত্যিই গাছের মগডালে উঠে যেতে হয়েছে একদিন, ঈশ্বরের রাজত্বে বিচিত্র লীলা কাকে বলে তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন সেখানে বসে থেকে।

সামনেই একটা বিল, ওরা বিপদ সংকেত দিল, তারপরেই যে যে দড়ি সামনে পেলো তরতরিয়ে বেয়ে উঠে গেল, তিনিও উঠলেন। প্রথমে এলো হরিণের দল, সংখ্যায় এবং বৈচিত্র্যে তারা অগণ্য। জল খেয়ে বিদায় নিতে না নিতেই, চলন্ত পর্বতের মতো সব গণ্ডারের দল এসে গা ঘষাঘষি করতে লাগলো গাছের গোড়ায়। মনে হয় এই বুঝি ভাঙলো। হাতের তালুতে প্রাণ ধারণ করে ডাল আঁকড়ে নিঃশব্দে বসে আছে সব, নিঃশ্বাস পতনের আওয়াজটুকুও যেন না শুনতে পায়।

গা ঘষা শেষ করেই উথাল পাথাল ঝগড়া মারামারি। গুঁতো-গুতির হুঙ্কারে কেঁপে উঠলো বনভূমি। এক সময়ে তারাও চলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আবার সব নিথর নিস্তব্ধ। যজ্ঞেশ্বর নামতে

গিয়েছিলেন, বন্ধু হাত চেপে ধরে নিঃশব্দে ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে বললো, 'চুপ। রাজা আসবে, অপেক্ষা করো।'

রাজা আসবে? কে রাজা? কোন রাজা? কৌতূহলে আক্রান্ত হলেন কিন্তু কথা বলার এক্তিয়ার নেই, শুধু সতর্ক হয়ে অপেক্ষা। ঘণ্টা খানেক বাদে যজ্ঞেশ্বরের শরীরের সমস্ত লোমকূপ খাড়া হয়ে উঠলো, নিঃশ্বাসের উত্থান পতন দ্রুত ঘন হলো, বুকের ভিতর এমন দপ দপ করতে লাগলো, মনে হচ্ছিলো বাইরে থেকেও শোনা যাচ্ছে।

এমন রাজা আর রাজপরিবার দেখবার কল্পনাও করেন নি তিনি।

এক বিশাল সিংহ তার কেশর ফুলিয়ে দাঁড়ালো এসে, ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো এদিক ওদিক, দর্পিত ভঙ্গীতে রাজাধিরাজের মতোই ধীর লয়ে হাঁটতে হাঁটতে জলের ধারে গেল। তারপরেই দেখা গেল সিংহিনী আসছে তার তিনটি শাবক নিয়ে।

শাবকেরা চঞ্চল। মায়ের কথা শুনছিলো না। দৌড়ে দৌড়ে চলে যাচ্ছিলো কোথায়, আবার ফিরে আসছিলো। সবাই জলের ধারে গেল। জল খোলা। জল খেয়ে এসে যে গাছের ডাল চেপে তাঁরা ভয় থেকে সামাল দিচ্ছিলেন নিজেদের সেই গাছের তলাতেই বসলো আরামের ভঙ্গীতে। কিন্তু সিংহিনী এসেই ধমকালো, আকাশে নাক তুলে কী শুকতে লাগলো। ভাগ্যিস তাদের দিকে চোখ পড়েনি। শুকতে শুকতেই চকিত হয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল বাচ্চাদের নিয়ে।

সিংহ লাল লাল চোখে তাকিয়ে দেখলো। তারপর সে-ও গাত্রোত্থান করলো।

এসব দৃশ্য কি ভোলবার? কিন্তু নাবিকের মৃত্যুর পর আর জলের

জীবনে থাকতে পারলেন না। তাঁকে ছাড়া সেই জীবন অথৈ জলেও মরুভূমি। দশ বছর বাদে আবার মাটি। সেবার জাহাজ এসে সাদামুটনে ভিড়তেই যে বন্দরে নামলেন আর ফিরে গেলেন না জাহাজে। এবার নতুন জীবন। এখন আর ভয় কী? পকেটে তাঁর অনেক সম্বল। অর্থ বিত্তের সম্বল নয়। যোগ্যতার সম্বল। পরিশ্রমের সঞ্চিত ফসল। কতো প্রশংসাপত্র ততোদিনে জমে গেছে। একটা ফ্যাক্টারিতে ঢুকে পড়লেন। 'কী কাজ চাও?' 'যে কাজ দেবে তাই?' পকেট থেকে বেরুলো কাজের সার্টিফিকেট, সামান্য হাত খরচের বিনিময়ে উচ্চতর শিক্ষানবিশীতে সাদরে গ্রহণ করলো তারা। তারপর সেই একই ফ্যাক্টারিতে একাদিক্রমে কুড়ি বছর। সাদাচামড়ার লোকের গুণগ্রাহিতা আছে। তারা তাকে নীচে ফেলে রাখেনি, হাতে কলমে শিক্ষিত লোকটাকে উঠতে দিয়েছে উপরে।

দিনে রাত্রে দেহপাত করে তিনি খেটেছেন, উপার্জন করেছেন, জমিয়েছেন স্বার্থপরের মতো সব নিয়ে ফিরে এসেছেন দেশে। কেন দেশে ফিরেছিলেন? কী হতো না ফিরলে? দেশের প্রতি এই কৃতজ্ঞতার কি কারণ ছিলো?

কি ছিলো কে জানে। এই ফ্যাক্টারি নির্মাণে নিঃশেষিত হয়েও একবারের তরে ভাবেননি না এলেই হতো। কপর্দকহীন হয়েও একবিন্দু হতাশা তাঁকে আক্রমণ করেনি। কতো লোক তার পিছনে, কতো লোকের মুখের হাসি, হৃদয়ের আশা তাঁর মূলধন, তাঁর কিসের ভয়? বরং কতো স্বজন পেয়েছেন তিনি। কতো বান্ধব। সত্যিই এদের সব্বাইকে তিনি বড়ো ভালোবাসেন।

যখন দেশে ফিরে এলেন তাঁর বয়েস কতো? তা তেতাল্লিশ চয়াল্লিশ তো নিশ্চয়ই। আর সেই হিসেবেই এই চব্বিশ বছর দেশের

বসবাসে সাতর্ষা ট্ট আটর্ষা ট্ট ধরেছেন। এই বয়সে কি শেষে এই প্রাপ্তি?

দশ

সুদূর থেকে কতোগুলো গলা ভেসে এলো; 'এই যে শুনছেন, আমাদের দাবী মেনে নিন, আপনাকে আমরা এখুনি ঘরে নিয়ে যাবো।'

'রাত কিন্তু অনেক হয়েছে, প্রায় দু'টো বাজে।'

'সুমন্তবাবু বরং আজ এ পর্যন্তই থাক, কাল দেখা যাবে।'

'পাগল। শেষে হার মানবো লোকটার কাছে?'

'বাইরে খুব ঠাণ্ডা। বয়স্ক লোক, ঠাণ্ডা লেগে যেতে কতোক্ষণ।'

'আরে, এদের হচ্ছে কচ্ছপের প্রাণ! কিছু হবে না। এরা আগুনে পোড়ে না, জলে ডোবে না, সাপে কাটলেও মরে না। দেখছেন না কেমন ঠেস দিয়ে ঘুমুচ্ছেন। আবার নাক ডাকছেন ফোঁৎ ফোঁৎ করে।'

'না না, অন্ধকারে ঠাহর না হলেও মনে হচ্ছে ওটা ওঁর নাক ডাকা নয়। অন্যরকম কিছু।'

'তাই নাকি।' (হালকা হাসি), 'বোধহয় মনের দুঃখে প্রাণত্যাগ করছে। কী বলেন? দেখুন তো নাভিশ্বাস উঠলো নাকি?' হাসি।

'ভেবে দেখুন, সেই থেকে কিছু খাননি, অন্তত এক গ্লাস জল অবশ্যই আমাদের দেওয়া উচিত।' এই গলা বিষণ্ণ।

'চুপ করো তো। বেশী বেশী দরদ দেখিও না।'

'একে তাড়াও।'

'হ্যাঁ, তাই করতে হবে।'

'বুঝলেন, খুন যে করিনি এই ওর চোদ্দপুরুষের ভাগ্য।'

'ভালো কথা, এই, রঞ্জনের খবর জানো তো?'

'কী।'

'দল ছেড়ে এখন বাপের সুপুত্তুর হয়ে বিলেত গেছে।'

'বিলেত! কী করছে সেখানে?'

'আবার কী! হারিয়ে তাড়িয়ে কাশ্যপ গোত্র। কোনোমতে তো বি. এ. পাশ করেছিলো, লণ্ডনে গিয়ে খাচ্ছে দাচ্ছে আর বিজ্‌নেস ম্যানেজমেণ্ট পড়ছে।'

'কিন্তু ওনাকে আর ঠাণ্ডায় ফেলে রাখা ঠিক নয়।'

'ঘুমুচ্ছে, ঘুমুতে দাও।'

'সাধু সমাদ্দারকে মনে আছে?'

'তা আর নেই।'

'এখন বলে বেড়াচ্ছে আমরাই নাকি ওর সবচেয়ে বড়ো শত্রু।'

'বোধহয় জল চাইছেন উনি।'

'আরে, এ লোকটা তো দেখছি বড় বেশী প্যান প্যান করছে।'

'আমার কী ইচ্ছে করে জানো? একটা হাতুড়ি নিয়ে এক ধারসে সব কটা বড়োলোকের মাথায় মারতে মারতে চলে যাই।'

'আশিসটা এখন খুব গাড়ি ফুটিয়ে বেড়াচ্ছে—'

'দেব বদমায়েসকে একদিন শেষ করে।'

'তা যাই বলিস, কী কষ্ট করে লেখাপড়া করেছে। রিফিউজি ছেলে, কলোনীতে থাকতো, উদয় অস্ত টিউশনি করতো—'

'আরে এতো একটা রোগ। কেবল কেরিয়ার তৈরী করা, আমি রাজত্ব পেলে সব আগে এই কেরিয়ারিস্টগুলোর মাথা কাটবো।'

'আচ্ছা, আমাদের যদি উনি ছাঁটাই করে দেন।'

'বাছাধনকে এক রাতেই এমন টিট করছি যে আর ঐ পথে তার পা পড়বে না।'

'কিন্তু কিছুতেই তো রাজী করাতেও পারছো না—

'পারবো, পারবো, সময়ে সবই হবে।'

'কেরিয়ারিস্ট বলে আশিসকে তুমি গালমন্দ করছো বটে, কিন্তু পরিশ্রম না করলে বসে বসে তো আর কিছু পাওয়া যাবে না।'

'শুনেছিস, কাল দু'টো পুলিশ খুন হয়েছে?'

'শুনলাম। কিন্তু আমার বড়ো কষ্ট হলো।'

'আচ্ছা, ওদের দোষ কী বল?'

'সত্যি আমারো কিন্তু এটা ঠিক খাঁটি মনে হয় না। ওরা হলো হুকুমের দাস, নেহাৎ নিরীহ গরীব লোক—'

'এ দেখছি গান্ধীর চ্যালা রে, যা যা বাড়ি বসে রঘুপতি রাঘব কর গিয়ে, দল ছাড়—'

'এই সুমন্ত—'

'কী।'

'তোর বাবার নাকি দু'শো বিঘা জমি আছে?'

'বাবার তো আমার কী?'

'শুনছি এখন তুই-ই মালিক।'

'বাজে কথা।'

অন্যস্বর, 'বাজে কথা নয়, আমিও জানি সে কথা ওর বাবা হেমন্ত চক্রবর্তীর ও-ই একমাত্র ছেলে। যেহেতু উনি মারা গেছেন—'

সমস্বর, 'তাহলে আপনিও একজন জোতদার?'

উত্তপ্ত গলায়, 'বিনোবা-ভাবেরও তো লক্ষ বিঘা জমি, তিনি কি জোতদার?'

'তাঁর জমি সকলের, আপনার জমি আপনার। তফাৎ আছে না? নাকি নেতাদের বেলায় সেটা এ্যালাউড?'

'স্টপ ইট। ননসেন্স।'

'এই ছাখো ছাখো, ভদ্রলোক কী রকম খাবি খাচ্ছেন। কী কাণ্ড। তোলো তোলো তোলো—'

যতোক্ষণে ওরা তুললো ততোক্ষণে তিনিও আবার বন্দর ছেড়ে জাহাজে উঠলেন। ঢেউয়ে ঢেউয়ে তোলপাড় সেই সমুদ্র। কোটি কোটি যোজন ব্যাপী শুধু জল জল আর জল। হেঁটে হেঁটে গড়িয়ে গড়িয়ে উপরের ডেকে উঠে যেতে চাইলেন। প্যাসেজ পেরিয়ে লোয়ার ডেক সেখান থেকে আপার ডেকের সিঁড়ি। উঠতে হবে সেই মাস্তুলের মাথায়। চল্লিশ ফুট উপর থেকে কে পড়ে গিয়েছিলো? গভীর রাত্রির ঘন অন্ধকারে একা একা ষ্টিয়ারিং ধরে কে দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে? ঐ তো বাঁশি বাজলো। আর কী আশ্চর্য! ঐ তো মরুভূমি পার হয়ে মা চলে এসেছেন কাছে। ঐ তো নাবিক পিতা দু'হাত প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছেন। না, আর আমার কোনো তৃষ্ণা নেই। আর আমাকে তোমরা ঘরে নিওনা! আমাকে আকাশের তলায় থাকতে দাও। বিন্দু বিন্দু শিশির ভিজিয়ে দিচ্ছে আমার শুষ্কজিহ্বা। আমি জল চাই না। নিঃশ্বাস নেবার জন্য আর আমার বাতাসের দরকার নেই। আমার ফুসফুস-ভরা নির্মল হাওয়া। দেখছো না কেমন ভেসে যাচ্ছি মেঘের মতো?

না, আর আমার কোনো দুঃখ নেই। বেদনা নেই, বাসনা কামনা ইচ্ছে অনিচ্ছে কিছুই নেই আমার।

যজ্ঞেশ্বরকে বিছানায় এনে শুইয়ে দিল ওরা। ঝাপসা ঝাপসা মোমের আলোয় এ ওর দিকে তাকালো। ফিসফিস করলো,

'অক্সিজেন। অক্সিজেন।' 'অসম্ভব। এই জঙ্গলে অক্সিজেন কোথায়?' 'নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না। 'ষ্ট্রোক।' 'বড়োবাবা, বড়োবাবা।'

রাত ভোর হলো। পুরোনো তিনটি কর্মী আর বৃদ্ধ ম্যানেজার রমাপতিবাবু ঝুঁকে রইলেন মুখের উপর। সুমন্তর বুকের ভিতরটা হঠাৎ কোথায় ব্যথা করে উঠলো। তারপরেই গীতার শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করলো। একদিন তো সকলেই তাঁর মুখ-গহ্বরে প্রবিষ্ট হতে হবে। ধর্মযুদ্ধ অবশ্যই কর্তব্য। স্বাভাবিক হতে চেয়েও গলা খাঁকারি দিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় বললো, 'চলো ফিরি। আর কোনো প্রয়োজন এর কাছে মিটবার নয়।'

সব চেয়ে যা বড়ো

গভীর রাত্রে জেগে জেগে শেষে সুকৃতির কানা চোখ জলে ভরে গেলো। আর পাঁচজন নরম হৃদয়ের স্বাভাবিক চেহারার মেয়েদের মতো তার হৃদয়ও বিধুর হয়ে উঠলো বেদনায়। যা ঈশ্বর দেননি তা আর পাবে কেমন করে, কিন্তু কেউ তো বোঝে না সে-কথা—আর কেন বোঝে না সেকথা ভাবতে ভাবতে উদ্বেলিত হৃদয়ে পড়ে রইলো চুপ করে। লাঞ্ছিত বিড়ম্বিত জীবনের ভার মনে হলো বড়োই দুঃসহ! তারপর অন্ধকার ঘরে একা বিছানায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

সব জায়গাতেই এই এক কষ্ট। যেখানে গিয়েই সে কাজ নিয়েছে, কয়েক মাসের মধ্যেই অসহ্য হয়ে উঠেছে তার জীবন। মুখের দিকে তাকিয়েই সকলের চোখে এমন এক বিস্ময় নামে কেন? আর তারপরেই অদম্য হাসির আবেগে তারা কেন চক্ষু নত করে? কি, কি আছে এই মুখে। কুৎসিত কি আর কেউ নেই এ-জগতে? মানুষ কি তার নাক চোখ মুখ দিয়েই মানুষ! তার বিদ্যা, তার বুদ্ধি, হৃদয়বৃত্তির কোমলতা, তার কি কোনোই মূল্য নেই, মানুষ কি দেখতে পায় না তার হৃদয়ের উত্তাপ?—সেও যে ভালোবাসতে পারে—দুঃখ পেতে পারে—এ-কথা কেন তারা বিশ্বাস করে না? কেন করে না? কান্নার বেগ আরো প্রবল হলো তার।

রাত গভীর হয়েছে, এত বড়ো বোর্ডিংটির এতগুলো মেয়ে আর এতগুলো শিক্ষয়িত্রী সব যেন মায়াস্পর্শে নিথর। একা—মাত্র একা ঘুম নেই তার চোখে। সে জেগে আছে ব্যথিত অন্তরে ঈশ্বরের

কৃপণতায় মর্মাহত হয়ে। এক সময় উঠে বসলো সে—তারপর অশ্রুভরা চোখে আলো জ্বেলে ধীর পায়ে দাঁড়ালো গিয়ে আয়নার কাছে। শ্রীহীন মুখ আর একটি নষ্ট চোখ নিয়েই সে জন্মেছিলো এবং জন্মের অনতিপরেই মার কোল থেকে মুখ থুবড়ে গরম দুধের কড়াইতে পড়ে গিয়ে একটি গাল আর গলার অর্ধেক পুড়ে গিয়েছিলো তার। ঘা শুকিয়ে গেলে মাসখানেকের মধ্যেই—কিন্তু পোড়ার দাগ মিলোলো না এই—আটতিরিশ বছর বয়সেও। এক গালের রং রইলো অসম্ভব কালো—আরেকটি গাল সাদা আর কালোর অসংগতিতে বীভৎস। আয়নায় ছায়া পড়লো সেই মুখের, সুকৃতি স্তব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো সেই ছায়ার দিকে।

ক্লাসে গেলে মেয়েরা যে ঢেউ হয়ে ওঠে—একটা চাপা হাসির তরঙ্গ যে প্রত্যেকটি শরীরের উপর দিয়ে বয়ে বয়ে যায় তার একটা সংগত কারণ আছে বইকি। কোনো শিক্ষয়িত্রী যে কখনোই তার সঙ্গে বসে দুটো কথা বলবার অবকাশ পান না তাও অসংগত নয়। যখন ছোটো ছিলো—কোনো বন্ধু ছিলো না তার, স্কুলে-কলেজে এতো বছরের মধ্যে এমন কারো সংস্পর্শ ঘটেনি তার জীবনে, যে এই চেহারার গণ্ডি অতিক্রম করে তার হৃদয়ের কাছে এসেছে, ভালোবেসেছে আর পাঁচজন মানুষের মতো। তারপর এলো এই কর্মজীবন। এই নিয়ে পাঁচটা স্কুল সে পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু এর পর? এর পর সে যাবে কোথায়? বিশ্বসংসারে এমন তো কেউ নেই তার যেখানে গিয়ে আত্মগোপন করে দুটি খেতে পাবে! বিধবা মা কবে মারা গেছেন, ভাইয়ের স্ত্রীরা ভালোবাসে না তাকে। তবে কোথায় সে যাবে? নির্মম ঈশ্বরের কাছে মনে মনে নতজানু হয়ে আয়নায় প্রতিফলিত মুখের উপর চোখ রেখে সে এই প্রশ্ন করলো।

তিন মাস এখানে এসেছে কাজ নিয়ে, দুরন্ত মেয়েরা যে কী দুর্ব্যবহার করে তার সঙ্গে তার আর কোনো তালিকা নেই—তাদের নিষ্ঠুরতা পর্বতের মতো। ঠাট্টা-বিদ্রূপ—বোর্ডে ছবি এঁকে রাখা—বড়ো বড়ো অক্ষরে নামকরণ, ক্লাসে গেলে নিজেদের মধ্যে বিশেষ ভাষার আদান-প্রদান—রহস্যময় দৃষ্টিক্ষেপ,—সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে যে যেখান থেকে পারছে ছুঁড়ে মারছে হাসির তুবড়ি—অবহেলা অশ্রদ্ধার কঠিন আঘাত। প্রথম প্রথম সহ্যের প্রতিমূর্তি হয়ে ছিলো সে—যেন দেখেনি, যেন বোঝেনি, হৃদয়ের উত্তাপ দিয়ে চেষ্টা করেছিলো স্নেহপাশে তাদের আবদ্ধ করতে; কিন্তু অসম্ভব। দল পাকিয়ে পাকিয়ে মেয়েগুলো অবিরাম হাসাহাসি করে—টেপাটেপি করে গায়ে গায়ে গড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া আছে ভৃত্যমহল, আছেন হেডমিস্ট্রেস নিজে—স্কুলের অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ—কারো হাত থেকেই রেহাই নেই এই চেহারা নিয়ে। তার চলতে পা কাঁপে, অকারণে সন্দেহ হয়, পা টিপে টিপে প্রত্যেক ঘরে গিয়ে কান পাতে তাদের হাসির শব্দ শুনতে।

কিন্তু সেদিন হলো চরম। রবিবারের ছুটি, মেয়েরা নিয়মমতো একটুখানি পড়াশুনো করলো কি করলো না—সময়মতো খেয়ে নিলো তাড়াতাড়ি—তারপর নাইন আর টেনের মেয়েরা জুটলো এসে এক ঘরে। সুপারিনটেনডেন্ট কয়েক ঘণ্টার জন্য বাইরে গেছেন, তাছাড়া বোর্ডিংয়ের যে ক'জন শিক্ষয়িত্রী আছেন তাঁরা বলতে গেলে কোনো রবিবারেই বোর্ডিংয়ে থাকেন না। তাঁদের জীবনে আত্মীয় আছে, বন্ধু আছে—আছে প্রীতিভাজন, স্নেহভাজন, নতুন-নতুন আস্বাদ—তারা কেন লোকলজ্জায় মুখ লুকিয়ে পড়ে থাকবে বোর্ডিংয়ের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে আবদ্ধ হয়ে? আধপোড়া গাল আর দুঃখভরা নিঃসঙ্গতা

নিয়ে একলা ঘরে দরজা বন্ধ করে পড়ে থাকে কেবল সুকৃতি। যথারীতি সেদিনও সবাই অনুপস্থিত—সুকৃতির পাশের বড়ো হল-ঘরটায় এসে মেয়েরা দরজা বন্ধ করে দিলো। তারপর উঠলো তাদের সমবেত কণ্ঠের কোলাহল। অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলো সুকৃতি, শেষে অসহ্য হতে উঠে এসে বন্ধ দরজায় টোকা দিলো। কিন্তু তার সেই মৃদু টোকা অতগুলো মেয়ের উচ্চহাসির দমকে কোথায় তলিয়ে গেলো। অত্যন্ত রাগ হলো তার। এ কী অসভ্যতা—পাশের ঘরে একজন গুরুস্থানীয়া বিশ্রাম করছেন, এত বড়ো ধেড়ে মেয়েগুলোর কি সেটুকু মর্যাদাবোধও নেই? জোরে সে ধাক্কা দিলো দরজায় আর ভেজানো দরজা সঙ্গে সঙ্গে খুলে হাঁ হয়ে গেলো। সে দেখতে পেলো, ক্লাস সেভেনের ছোটো যূথিকার এক গালে কালো কালি মাখানো হয়েছে, আরেক গালে কালির ফাঁকে ফাঁকে চুনের ছিটে লাগিয়ে এক বীভৎস মূর্তি করে সাজিয়েছে তারা। সাদা কালোপাড় শাড়ি (সাধারণত যা সে পরে) সোজা ড্রেস করে পরিয়ে বসিয়েছে একটা চেয়ারে—এক একবার মুখ বিকৃত করে কী বলে উঠছে সে, সঙ্গে সঙ্গে অতগুলো মেয়ে একসঙ্গে হেসে উঠে গড়িয়ে পড়ছে এ-ওর গায়ে। এক পলক তাকিয়ে সুকৃতির যেন আগুন ধরে গেলো মাথার মধ্যে—অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রগতিতে ঢুকলো সে ঘরের মধ্যে—কোনোদিকে না তাকিয়ে ছুটে সে এগিয়ে এলো যূথিকার কাছে, তারপর একেবারে ক্ষিপ্তের মতো এলোপাথাড়ি চড়ে-কিলে-কানমলায় উদভ্রান্ত করে দিলো মেয়েটিকে। আর সব মেয়ে পাথরের মতো স্তব্ধ। যখন সে থামলো, ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর-মন যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। দাঁড়ালো না, বেগে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে, তারপর নিজের ঘরে গিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলো।

একটু চুপচাপ। এমন চুপচাপ যে, সারা বোর্ডিং-বাড়িটায় যেন গভীর রাতের ছমছমানি নামলো। পরক্ষণেই বন্ধ দরজার বাইরে ভিড় করে এসে দাঁড়ালো সমস্ত বোর্ডিং—বড়ো মেয়েদের বিদ্রোহী গলা তীরের মত এসে বিঁধলো সুকৃতির বুকের মধ্যে, 'খুলুন, দরজা খুলুন, নয়তো ভেঙে ফেলবো দরজা, সাহস থাকে ত বেরিয়ে আসুন না!' সম্ভাষণের সঙ্গে সঙ্গে দুমদাম ধাক্কা পড়তে লাগলো দরজার বাইরে।

একখণ্ড পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সুকৃতি—খিলও খুললো না, জবাবও দিলো না। গালাগালি, চেঁচামেচি, বেড়ালের ডাক, কুকুরের ডাক—দরজায় লাথি—প্রায় একঘণ্টা চললো এই অসভ্যতা আর প্রতিবাদের তাণ্ডবলীলা, তারপর ধীরে ধীরে শান্ত হলো কলরোল। সুকৃতি এবার বসলো এসে খাটের উপর, জানালা দিয়ে চেয়ে রইলো বাইরের সাদা আকাশের দিকে, চোখের দৃষ্টিতে যেন সুখদুঃখের প্রশ্ন জীবন থেকে সে মুছে ফেলেছে।

একটু পরেই বাজলো বিকেলের ঘণ্টা—মেয়েরা খেতে যাচ্ছে—তাদের পায়ের দুপদাপ শব্দ সে কান পেতে শুনলো—কেমন জোরে জোরে নিশ্বাস বেরুতে লাগলো বুকের ভিতর থেকে—চুপ করে শুয়ে পড়লো সে।

সন্ধ্যের আগেই ফিরে এলেন সব মিস্ট্রেসরা—সুপারিনটেনডেণ্ট সব কথা শুনলেন মনোনিবেশ সহকারে—মেট্রন চোখ বড়ো বড়ো করে মেয়েদের পক্ষ নিয়ে কথা বললেন—সুকৃতি ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও সবই টের পেলো, আর নিজেকে প্রস্তুত করবার শক্তি খুঁজতে লাগলো ভিতরে ভিতরে।

'মিস সেন!' দরজার বাইরে থেকে বোর্ডিং-সুপারিনটেনডেণ্টের

গম্ভীর আওয়াজ ভেসে এলো ঘরের মধ্যে। বুকের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেলো সুকৃতির। 'মিস সেন!' ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে মিসেস চ্যাটার্জি আবার ডাকলেন। 'হ্যাঁ, খুলছি'—অসংবৃত শাড়ি ঠিক করে নিয়ে দরজা খুলে দিল সুকৃতি; ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'আসুন।'

মিসেস চ্যাটার্জির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মিস্ট্রেসরাও এলেন—আর এলো নাইন-টেনের মেয়ে ক'টি। মিসেস চ্যাটার্জি প্রথমটায় ভদ্রভাবেই এই মারধোরের কৈফিয়ৎ তলব করেছিলেন। কলকলিয়ে উঠলো মেয়েগুলো। সুকৃতি বললো, 'বলবার জন্যে ত এদেরই নিয়ে এসেছেন।'

'আমরা! নিশ্চয়ই আমরা আসবো',—চোখে মুখে কথা বলে উঠলো সুপ্রীতি মিত্র (ক্লাস টেনের পাণ্ডা), 'আপনি ভেবেছেন কী? যা খুশি তাই করে অমনি-অমনিই পার পেয়ে যাবেন?'

'না, তা ভাবিনি—' অত্যন্ত শান্তগলায় সুকৃতি বললো, 'ভেবেছি যে, তোমাদের মতো অসভ্য মেয়েদের কণ্ট্রোল করতে হলে উঠতে বসতে চাবুক মারা উচিত।'

'কী, কী, বললেন?' সব কটি মেয়ে রুখে উঠলো একযোগে।

মিসেস চ্যাটার্জি উষ্ণগলায় বললেন, 'মেয়েদের কাছে অপমানিত হয়ে কোন গৌরব নেই, মিস সেন—নিজের সম্মান নিজের কাছেই—আপনি ভালো করে কথা বলতে শিখুন।'

'আমার কি আর শিক্ষা নেবার বয়স আছে? শিক্ষিত হতে ত আসিনি, শিক্ষা দিতেই এসেছি।'

'কী রে আমার—' একটি মেয়ে মুখব্যাদান করে হাতের পাতা উল্টালো—অন্যান্যরা মুচকি হাসি দিয়ে বড়ো হাসি গোপন করলো।

মিসেস চ্যাটার্জি অপমানিত বোধ করলেন সুকৃতির কথায়—তাঁর কণ্ঠস্বরে ক্রোধ সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো, 'হ্যাঁ—শিক্ষিত করবার ভার যাতে

আর আপনার হাতে না থাকে তারই ব্যবস্থা করতে হবে। হেড-মিস্ট্রেসকেও খবর পাঠানো হয়েছে—'

'আর একদিনও যদি ওঁকে রাখা হয়—' গর্জে উঠলো মেয়েরা—'সব মেয়ে আমরা বোর্ডিং ছেড়ে দেবো—স্কুলে কোন ক্লাস করবো না—দেখবো কি করে আপনারা চালান।'

'চুপ করো—' একজন মিস্ট্রেস ধমক দিয়ে উঠলেন, 'তোমরা তো যা বলবার বলেইছো—আবার কেন জটলা করছো এখানে এসে!'

ধমক খেয়ে সচকিত হলো মেয়েরা।

'যাও তোমরা—' আবার তিনি আদেশের সুরে বললেন।

মিসেস চ্যাটার্জি কিছু হয়তো বলতে চেষ্টা করেছিলেন মেয়েদের পক্ষ নিয়ে—তিনি বলবার অবকাশ না-দিয়ে একরকম জোর করেই বার করে দিলেন মেয়েদের। দুই চোখে কৃতজ্ঞতা ফুটিয়ে সুকৃতি নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলো তাঁর দিকে।

'মেয়েরা খেপে গেছে, এখন আপনি কি করবেন?' মিসেস চ্যাটার্জি তাঁর মর্যাদামাফিক কৈফিয়তটি আবার তলব করলেন।

একটু সহানুভূতির আভাসেই সুকৃতির চোখ ছলছলে হয়ে উঠেছিলো—এই প্রশ্নের জবাব সহসা দিতে পারলো না, একটু পরে মুখ তুলে বললো, 'আপনি কী বলেন?'

'ভবিষ্যৎ ভেবে আপনার কাজ করা উচিত ছিলো', গুরুজনের ভঙ্গিতে রায় দিলেন তিনি।

'আমার তখন কাণ্ডজ্ঞান ছিলো না, মিসেস চ্যাটার্জি।'

'তা বললে তো তারা ছাড়বে না!' অন্য একজন জবাব দিলেন।

চুপ করে রইলো সুকৃতি। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘর আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। ফাল্গুন মাসের পাগলাটে হাওয়া মাঝে মাঝে টেবিলের কাপড়,

বিছানার চাদর, শাড়ির আঁচল আর ক্যালেণ্ডারের ছবির উপর দিয়ে অজস্রধারে বয়ে বয়ে গেলো।

হেডমিস্ট্রেস মিসেস পাকড়াশী এসে ঘরে ঢুকলেন। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে একটি দর্শনযোগ্যা চেহারা। সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে আলো জ্বালালো তাড়াতাড়ি। আবার দরজার ধারে ভিড় জমলো মেয়েদের। উঠলো একটা গুনগুনানির ঢেউ। তিনি ইঙ্গিত করলেন তাদের, তারপর দরজা ভেজিয়ে দিলেন।

বেশি কিছু বলাবলির দরকার হলো না, সুকৃতি নিজে থেকেই চলে যেতে চাইলো চাকরি ছেড়ে দিয়ে, কেবল অন্য বাসস্থান চিন্তা করবার জন্য সময় ভিক্ষা চাইলো সে।

রাত্রিবেলাই সে-খবর মিসেস চ্যাটার্জি মেয়েদের কাছে পৌঁছিয়ে দিলেন, কিন্তু শোনামাত্রই তারা ঘোড়ার মতো ঘাড় উঁচিয়ে দাঁড়ালো —'অ্যাপলজাইস করতে হবে আমাদের কাছে। দস্তুরমতো জোড়হাত করে ক্ষমাপ্রার্থনা।' যূথিকার দূর সম্পর্কের এক বোন—সে নাইনের ছাত্রী—গম্ভীরমুখে বললো, 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, যূথিকার বাবা বীরভূমের কর্তা। হাকিমি মেজাজের মানুষ, তিনি কি সহজে ছাড়বেন আপনাদের! মা-মরা মেয়ের দায়িত্ব নিয়েছেন আপনারা—তিনি নিজে এসে মেয়ে রেখে গেছেন আপনাদের কাছে—আমাকেও এই বোর্ডিংয়ে রাখার এই কারণ যে, আমি ওর দেখাশুনো করতে পারবো।'

মিসেস চ্যাটার্জি একটু ঘাবড়ালেন এ-কথায়। কলেক্টর মানুষ—বলা তো যায় না—আর তিনি যখন সুপারিনটেনডেণ্ট, দায়িত্ব অবশ্যই তাঁর—মুখ কাঁচুমাচু করে 'আচ্ছা সে সব হবে' বলে চলে গেলেন তিনি—আর মেয়েরা সরোষে গর্জন করতে লাগলো দাঁড়িয়ে, বসে, হেলান দিয়ে—নানা ভঙ্গিতে। বোঝা গেলো, সুকৃতিকে তারা নিঃশব্দে চলে যেতে দেবে না, তাদের নিষ্ঠুরতা তাকে নিগ্রহের শেষ সীমায় নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু রাত হয়ে গিয়েছিলো বলে আর বেশিক্ষণ তারা জটলা পাকাতে পারলো না, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শুতেই হলো আলো নিবিয়ে।

পরদিন সকালবেলা দেখা গেলো. যূথিকা আর গা তুলতে পারছে না বিছানা থেকে। দুই চোখ জবাফুলের মতো লাল, অস্বাভাবিক শরীরে ব্যথা। যন্ত্রণায় সে শিশুর মতো কাঁদতে লাগলো। সুকৃতির

বন্ধ দরজার উপর মেয়েদের সরব এবং নীরব যে-সব রাগ আর বিদ্বেষ বর্ষিত হতে লাগলো, তার যদি কোনো অলৌকিক ক্ষমতা থাকতো, তাহলে ভিতরের মানুষটির কোনো ঠিকানা থাকতো না এ-সংসারে। মিসেস চ্যাটার্জি সুদ্ধ অভদ্র হয়ে উঠলেন এই খবরে। মিসেস পাকড়াশী এসে বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করে ডাক্তারকে ডেকে পাঠালেন। যূথিকাকে সিক্‌রুমে নেওয়া হলো। লম্বা বারান্দা পেরিয়ে শেষ প্রান্তে একেবারে আলাদা এক মস্ত ঘরে, ছোট্টো খাটে একা একা শুয়ে রইলো সে। মেয়েরা বললো, 'ভাবিসনে যূথিকা, আমরা ফাঁক পেলেই তোর কাছে চলে আসবো। আর তোর এই অবস্থা যে করেছে তার প্রতিশোধও নেবো আমরা।'

বেলা বেড়ে গেলো, ডাক্তার আর এলেন না সে-বেলা, মিসেস পাকড়াশী বিড়বিড় করতে করতে চলে গেলেন। মেয়েরা, মিস্ট্রেসরা স্কুলের জন্যে তৈরী হলো।

বিকেলে ডাক্তার এসে দেখে বললেন, 'বসন্ত। একেবারে আসল বসন্ত!' সংবাদটি রটনা হতে দেরি হলো না—এবং সঙ্গে সঙ্গেই সারা বোর্ডিংটি একেবারে থমথমিয়ে উঠলো। ফাল্গুনের প্রথম, দস্তুরমত শীত এখনো—এখনই যে বসন্ত দেখা দেবে কে জানে। তবুও কেন টিকে দেওয়া হয়নি এ-নিয়ে আলোচনা হতে লাগলো সকলের মধ্যে—কর্তৃপক্ষের এ রকম অবহেলা যে কত সাংঘাতিক বিপদ আনে এ বিষয়ে কোনো মতভেদ রইলো না। মেয়েরা সুকৃতিকে ভুলে গেলো, যে যূথিকার সমবেদনায় এ-দু'দিন তাদের দুঃখের অবধি ছিলো না তার কথাও মনে রইলো না, একটা আসন্ন বিপদের ভয়ে তারা যেন দিশেহারা হয়ে উঠলো। এতগুলো মেয়ে আর মাস্টারনি এখন কোথায় যায়? এখানে এই একই বাড়িতে যূথিকার সঙ্গে বসবাস

করলে কি কেউই রেহাই পাবে? মিসেস চ্যাটার্জি তো বসে পড়লেন হাত-পা ভেঙ্গে—পাকড়াশী সিক্‌রুমের দরজাটি শক্ত হাতে বন্ধ করে দিলেন। মেট্রন ছুটে গিয়ে শুয়ে পড়লেন নিজের ঘরে—তাঁর মনে বদ্ধ ধারণা হলো, আর সবাই যেমন-তেমন, তিনি তো দুবার গিয়েছিলেন ও-ঘরে—নির্ঘাৎ তাঁর ছোঁয়াচ লেগেছে। প্রত্যেকের মধ্যে একটা দুর্নিবার ভয়ের স্রোত যেন শিরশির করতে লাগলো। মিসেস পাকড়াশী নিজের বিবর্ণ মুখে ঈষৎ রক্তসঞ্চার করে সাহস দিতে চেষ্টা করলেন তাদের। উপায় ছিলো না, কেননা সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, এখন ইচ্ছে করলেই কোথাও চলে যাওয়া সম্ভব নয়। মেয়েরা চুপ করে যে যার জায়গায় গিয়ে বসে রইলো—মাস্টারনিরা চিন্তাকুল হয়ে যাবার জায়গা স্থির করতে লাগলো মনে মনে।

পরের দিন সকাল হতেই যে যার ব্যবস্থায় ব্যাকুল হয়ে উঠলো। নিজেদের-নিজেদের মধ্যে চলতে লাগলো প্রাণ বাঁচানোর গুনগুনানি, জিনিসপত্র গোছাবার পরিস্ফুট ব্যস্ততা। বেলা প্রায় ন'টার সময় পাকড়াশী এলেন টিকেদার নিয়ে এবং মিসেস চ্যাটার্জি তাঁকে দেখে এই প্রথম বেরুলেন ঘর থেকে: নিচু গলায় বললেন, 'আমার শরীর খারাপ হয়েছে, আমি আজই চলে যেতে চাই।'

'সে কী!' ভ্রূ কুঞ্চিত করে পাকড়াশী তাঁর মুখের দিকে তাকালেন! 'আপনি চলে গেলে কি করে হয়?'

'আমাকে যেতেই হবে।'

'বোর্ডিংয়ের কর্তা আপনি—আপনিই যদি—'

'তাই বলে তো নিজের জীবন বিপন্ন করতে পারি না, মিসেস পাকড়াশী।'

মিসেস পাকড়াশী তাঁর কথার ধরনে অবাক হয়ে গেলেন। হেড-মিস্ট্রেসের জুতোর শব্দ শুনলেও যে হাত ঘষতে থাকে, তার আজ এই মূর্তি যেন তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না। গম্ভীর গলায় বললেন, 'কাজ যখন নিয়েছিলেন তখনই এসব ভাবা উচিত ছিলো।'

'না, এতদূর আমি ভাবতে পারিনি যে, বসন্ত লাগলেও জোর করে আপনারা আটকে রাখবেন। আমি যাবোই।'

'চাকরি—'

'না হয় যাবে—'

'তবে যান, এক্ষুনি বেরিয়ে যান এখান থেকে—' রাগে চোখমুখ লাল হয়ে উঠলো মিসেস পাকড়াশীর।

'প্রভাদি—' কাঁচুমাচু মুখে নতুন মিস্ট্রেস উষা ভট্টাচার্য এগিয়ে এলো গুটি-গুটি।

'কি? কি চাও তুমি?' মিসেস পাকড়াশী প্রায় চীৎকার করে উঠলেন।

'আমি—'

'থামলে কেন? বলো, যেতে চাই—হ্যাঁ, যাও, সব বেরিয়ে যাও চোখের সামনে থেকে।'

এতক্ষণে দেখা গেলো, দূরের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন, মেট্রন-মাসীমা। তাঁর মোটা শরীরে যেন আর বল নেই মনে হলো। কাছে এসে মিসেস পাকড়াশীর রাগী-মুখের দিকে এক পলক তাকিয়েই নিস্পৃহ গলায় বললেন, 'আমার ভাইপোর অসুখ, প্রভাদি—আমি আজ দেশে যাবো।'

দাঁতে দাঁতে ঘষলেন প্রভাদি, তারপর মুখ ভেংচিয়ে বললেন, 'ছুটি মঞ্জুর করুন, এই তো? কিন্তু রোগী দেখবে কে?'

'সে আমি কী জানি। আত্মজনের চাইতে তো বোর্ডিংয়ের মেয়ে বেশি না!'

চমৎকার যুক্তি। আর এমন নির্ভীক কথাবার্তা—মিসেস পাকড়াশী যেন কথা বলতে পারলেন না রাগে—কটমটিয়ে তাকালেন সক্কলের দিকে—তারপর উঁচু হিল ঠকঠকিয়ে চলে যেতে-যেতে অস্ফুট গলায় বললেন, 'পুলিশ দিকে আট্‌কাবো সব কটাকে।'

যেমনি অস্ফুট গলায় পিছন থেকেও উচ্চারিত হলো, 'ঈশ!'

বাড়ি গিয়ে মিসেস পাকড়াশী আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে লাগলেন। মেয়েটা তো কাল থেকে একা পড়ে আছে। কে জানে কেমন রাত কেটেছিলো—একদিন হয়তো মরেই থাকবে। যত সব অনাছিষ্টি। মেয়েটার উপরই তাঁর দারুণ রাগ হলো। কী দরকার ছিলো বাপু এই অসুখটি বাধাবার। তিনি তাঁর আঠারো বছরের চাকুরে জীবনে এত বড়ো একটা নচ্ছার মেয়ে আর দেখেননি। কিন্তু মেয়েটা নচ্ছার বলে তো আর তিনি ছাড়া পাবেন না, আত্মীয়গুলো তো তাঁকেই ছিঁড়ে খাবে। ডাক্তারকে ডেকে পাঠালেন তিনি।

'আপনার রোগী দেখবেন না?'

'আমি এ-রোগের কী করবো—' উদাসীন হয়ে ডাক্তার বললেন।

'তাহলে কি আমি দেখবো?' খিঁচিয়ে উঠলেন মিসেস পাকড়াশী—'অন্তত একটা নার্স ঠিক করে দিন দয়া করে।'

'এই মফস্বলে কি নার্স পাওয়া সহজ হবে?'

'ওদিকে ত সব পালাচ্ছে—মিসেস চ্যাটার্জি, মেট্রন, মেয়েরা—কী মুশকিল বলুন তো!'

'তাই তো।'

'কিন্তু আমার তো আর পালাবার উপায় নেই। এই তো দেখুন,

কাল কত রাত পর্যন্ত দেখাশুনো করতে হলো, আজ এই এত বেলা ওখানেই কাটালুম—অস্পৃশ্যই হোক, যা-ই হোক—আমি তো ফেলতে পারি না। তারপর একটা ভালো-মন্দ হলে তো আমাকেই—'

'সেই তো।'

'আপনারা তো সব দেখছেন, আমি কী রকম আপ্রাণ করছি, বলবেন সেকথা গার্জেনদের—'

'নিশ্চয়ই!'

'আচ্ছা।'

'আচ্ছা—' ডাক্তার উঠে গেলেন। আর মিসেস পাকড়াশী আবার আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে লাগলেন।

বেলা এগারোটার মধ্যে খালি হয়ে গেলো সারা বোর্ডিং। খানিক সময় ঝি-চাকরদের চলাফেরা আর কর্কশ গলার একটা আভাস মাত্র, তারপরেই একেবারে নিথর নিঝুম। দুপুরের একটা খাঁ-খাঁ আর ছমছমে ভাব নামলো সারা বাড়িটার উপর। আর সেই বাড়ির প্রকাণ্ড সিক্‌রুমের একপ্রান্তে একটি অপরিসর খাটে ধুঁকতে লাগলো যূথিকা। যেই থেকে তার ব্যায়রামটি ঘোষণা হয়েছে সেই থেকে একলা ঠিক এই রকম করেই পড়ে আছে সে। রাতটা কেমন কেটেছিলো তার কোন স্মৃতিই মনে আনতে পারলো না। আরক্ত চোখ মেলে ঘরের চারদিকে ব্যাকুলভাবে কী যেন খুঁজলো, অস্ফুট শব্দ করে একবার মাকে ডাকলো, তারপর চোখ বুজে ছটফট করতে লাগলো অস্থির হয়ে। সমস্ত শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা ব্যথায় ফেটে গেলো, জ্বলে গেলো, পুড়ে গেলো। জল কই? আবার চোখ খুললো সে···উত্তপ্ত হাতটি মেলে ধরলো কিসের প্রত্যাশায়···ব্যর্থ হয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করতে লাগলো। জল, জল চাই···প্রাণপণ চেষ্টায় সমস্ত ইচ্ছা-

শক্তিকে সে চালিয়ে নিয়ে গেলো ঘরের কোণের জলভরা কুঁজোটার দিকে, কিন্তু শরীর গেলো না, কেবল খাট থেকে আদ্ধেক পর্যন্ত একটা অংশ ঝুলে পড়লো মাটির দিকে।

হয়তো একটু সময় অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলো সে, কিংবা তৃষ্ণার বুকফাটা আবেদনে মুহ্যমান হয়ে গিয়েছিলো—সহসা তার জ্বরতপ্ত বসন্তভরা দেহে যেন কার শীতল স্পর্শ লাগলো, চোখ মেলে সে তাকালো তার দিকে, তারপর তাকিয়েই রইলো, চোখ আর ফেরাতে পারলো না। দুটি স্নেহভরা হাতে সুকৃতি তাকে আস্তে শুইয়ে দিলো বালিশের উপর—ঝুঁকে পড়ে বললো, 'বড়ো কষ্ট?'

যূথিকা জবাব দিলো না, শুধু দুইচোখ-ভরা জল নিয়ে অস্ফুটে উচ্চারণ করলো, 'মা!'

ভাই বোন

তুলতুলের যেদিন চার বছর পূর্ণ হলো ঠিক তার পর দিন সকালে ঘুম ভেঙে উঠেই দেখলো তার একটা ছোট ভাই হয়েছে। মার পাশে—বুকের কাছটিতে যেখানটায় রোজ সে নিজে ঘুমোয় সেখানটায় শুয়ে-শুয়ে ঘুমুচ্ছে আরাম করে—একটা লাল টুকটুকে ডলপুতুলের মতো। বাবা তাকে কোলে করে এসে দাঁড়ালেন সেখানে, মার বিছানা থেকে একটু দূরে—গালে চুমু খেয়ে বললেন, 'দেখছো, কেমন সুন্দর ভাই হয়েছে তোমার—তোমার ভাই—একেবারে একা তোমার।' খুশিতে আলো হয়ে উঠলো তুলতুলের ফোলা-ফোলা মুখ—তার চার বছরের ছোট্ট জীবনে এমন সুখের ঘটনা আর কি ঘটেছে কখনো? এমন সুন্দর

জীবন্ত-পুতুল নিয়ে কি খেলতে পেরেছে? ছেঁচড়ে-মেচড়ে সে নেমে গেলো বাবার কোল থেকে—তারপর এক ছুটে বিছানার কাছে। যে চেঁচিয়ে বারণ করলো, এতক্ষণে তুলতুলের নজর পড়লো তার দিকে—সে আঁতুড়-ঘরের দাই। কালো, মোটা, বিচ্ছিরি—ডাইনি না তো? ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়ালো তুলতুল, তারপরেই ঠোঁট কাঁপিয়ে—ভ্যাঁ।

দুর্বল মা শুয়ে আছেন চুপ করে—হাত বাড়িয়ে বললেন, 'ও মা, কাঁদে নাকি? তোমার একটা ভাই হয়েছে না ছোট্ট—সে শুনলে বলবে কী? ছি-ছি—এই দেখ কী রেখেছি তোমার জন্য।' নিজের জন্য রাখা বিস্কুটের টিনটা তিনি টেবিলের উপর থেকে তুলে ঠেলে দিলেন তুলতুলের দিকে, স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওকে নিয়ে যাও এখান থেকে—বিস্কুট-টিস্কুট দিয়ে যদি ভুলিয়ে রাখতে পারো। বাতাসিকে ডাকো না—মুখটুখ ধুইয়ে দুধ খাইয়ে দিক।'

ডাকতে হলো না, বাতাসি নিজেই এসে মুখ বাড়ালো ঘরে, 'এসো, মুখ ধুইয়ে দি—এখন আর অত মার কাছে আহ্লাদ না—মা এখন ভাইয়ের—'

তুলতুল তার চকচকে কালো চোখ তুলে ধরলো মার মুখের উপর। মা অস্থির হয়ে উঠলেন—'এ সমস্ত কী যা-তা বলছিস—কক্ষনো ওকে ও-রকম বলবি না বলে দিলুম—যাও তো বাবা—আমার লক্ষ্মী সোনা, মুখ ধুয়ে, দুধ খেয়ে এসো—আমার অসুখ করেছে কিনা, তাই ডাক্তার কাউকে বিছানায় আসতে বারণ করে দিয়েছেন—'

'ভাই আছে কেন?' ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদো-কাঁদো গলায় বললো তুলতুল।

বাবা বললেন, 'ভাইটা তো বিচ্ছিরি, হাঁটতে পারে না, কথা বলতে পারে না, কেবল-কেবল শুয়ে থাকে—তুমি কী সুন্দর দুধ খেতে জানো, কথা বলতে জানো—'

একটু-একটু খুশি হলো তুলতুল—তারপর আরো দু'একবার খোশামোদের পর বাতাসির কোলে চড়ে, মুখ ধুয়ে দুধ খেতে গেলো। দিনের বেলা একরকম মন্দ কাটলো না, কিন্তু রাত্তিরে ভারি গোলমাল আরম্ভ করলো তুলতুল—কিছুতেই সে মার কাছ ছাড়া ঘুমুবে না—মার হাতে ছাড়া খাবে না—সে এক মহা ব্যাপার। অবশেষে মা কাছে নিলেন তাকে—বাচ্চাটাকে দাইয়ের কোলে দিয়ে শোয়ালেন নিজের কাছে। পাশের ঘর থেকে, এই উপলক্ষ্যে আসা বুড়ি-মামীশাশুড়ী ক্যাট ক্যাট করতে লাগলেন, কিন্তু তুলতুলের বাবা বললেন, 'হাঁঃ—অত সব নিয়মকানুন নাকি চলে কখনো—কাল থেকে তুলতুল ওর মার সঙ্গেই খাবে-টাবে ঘুমুবে।' এই বলে হাঁপ ছেড়ে তিনি নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। আর এদিকে মা দুর্বল শরীর নিয়ে চাপড়াতে লাগলেন মেয়েকে, প্রতিদিনের মতো গুনগুনানি সুর ধরলেন ঘুম-পাড়ানি গানের। তাঁর যেন কেমন কষ্ট হতে লাগলো এই চার বছরের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞীটির জন্য—মনে হলো তিনি নিজেই তাকে আজ নামিয়ে দিলেন সিংহাসন থেকে—আর ঐ খুদে মানুষটা, যে মাত্র আঠারো ঘণ্টা আগে এসে জুড়ে বসেছে তাঁর কোলে, সে-ই যেন সর্বেসর্বা হয়ে উঠলো হঠাৎ। আর ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে তুলতুলের ছোট বুকেও কোথায় জানি একটা ব্যথা লেগে রইলো, যার কোন কারণ সে জানে না, বোঝে না—বোবা অন্ধ একরত্তি বেদনাবোধ।

তারপরে তিন-চার মাস কেটে গেলো আর বাচ্চাটার এই গোপ্তা-গোপ্তা গোল-গাল হাত-পা ছুঁড়ে-ছুঁড়ে কী খেলার ধুম! হাসতে

গেলে যখন মোটা-গালের ভাঁজে চোখ দুটি ডুবে যায়—তখন সকলে হেসে ওঠে একসঙ্গে। বাড়ির সকলের সব মনোযোগ সেই বাচ্চার দিকে। মার তো সময়ই নেই, রাত-দিন তিনি ব্যস্ত খোকাকে নিয়ে, এই দুধ খাওয়াচ্ছেন, এই বোতল ভেজাচ্ছেন জলে—স্নান করাচ্ছেন সময়মতো—তার কাজলটি, পাউডারটি, কমলালেবুর রসটি—এত কিছুর ফাঁকে ফাঁকে তিনি একসময়ে টেনে নেন তুলতুলকে।—'আয়, শিগগির আয়।'

'ন্-না।'

'না কী রে, বেলা হলো কত—স্নান করে খেতে হবে না?'

'আমি খাবো না।'

'না, খাবো না! অমনিই তো প্যাঁকাটি হচ্ছেন দিন-দিন—আবার, খাবো না!'

খপ করে এক টানে তাকে কাছে আনেন, পটপট করে জামার বোতাম খুলে দেন, খসরখসর করে এক ধাবড়া তেল মাখিয়ে দেন মাথায়—বলেন, 'এত দিক করিস কেন রে সারাদিন? একটু লক্ষ্মী হয়ে থাকতে পারিস না?' ড্রামভর্তি জল থেকে ঘটি দিয়ে তুলে গবগব করে কত তাড়াতাড়ি যে তার স্নান সেরে গা মুছে দেন তার ঠিক নেই।

তুলতুলের মন ব্যথায় ভরে ওঠে—মার হাত কী সুন্দর নরম ছিলো আগে, আস্তে টেনে তিনি বুকের কাছটিতে নিয়ে বলতেন, 'স্নান করবে না সোনামণি'—তুলতুল এখনকার মতো তখনো ছিটকে সরে যেতো—মা আবার কোলে তুলে নিতেন—চুমু খেতেন—সে যত আপত্তি করতো—মা তত আদর করতেন, তারপর নরম হাতে তেল মাখাতেন, খেলার মতো করে সাবান দিয়ে দিতেন গায়ে, গান গেয়ে গেয়ে জল ঢেলে দিতেন মাথায়—স্নান হতো তার একটা খেলা।—আর, এখন?

এখন মার সময় নেই—এখন দশটা বাজতেই মা চকিত হয়ে আর তাকে স্নান করান না, করান ভাইকে—নেংটো করে কতক্ষণ যে বুলিয়ে বুলিয়ে তেল মাখান আর তেল মাখাতে মাখাতে ঐ ফোলা আর লালাভরা মুখে নিচু হয়ে হয়ে কত যে চুমু খান—তুলতুল চেয়ে-চেয়ে দেখে, মার মুখের অত চুমু থেকে একটি চুমুর জন্য মন তার আকুল হয়ে ওঠে—মা তা লক্ষ্যও করেন না। ছোট্ট সিল্কের টুকরো দিয়ে আস্তে আস্তে দামি সাবান ঘষে দেন ভাইয়ের গায়ে—সাদা গামলায় তার ছোট্ট শরীর ডুবিয়ে দিয়ে কী আদর, তারপর ওঠাতে গেলে যতবার কাঁদবে ততবার মা ডোবাবেন তাকে—তারপর যখন তুলবেন, কোলে নিয়ে কত নরম করে গা মোছাবেন—পাউডারের ঘন প্রলেপে সাদা করে দেবেন শরীর, তারপর কাজল পরিয়ে—ঐ দু'গাছা পাৎলা চুলে লাল চিরুনি একঘণ্টা বুলিয়ে, খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে, তবে মনে পড়বে তুলতুলের কথা।

স্মৃতির কাঁটা খচখচ করতে থাকে তুলতুলের বুকের মধ্যে! মার এই মনোযোগ, এই আদরের ভাষায় রাতদিন আবোল-তাবোল কথা ঠিক এমন করেই বুকের মধ্যে নিয়ে খাইয়ে-দাইয়ে-ঘুম পাড়ানো—সেই সব কথা মনে পড়ে তার—আবছা আবছা বোঝা-না-বোঝার মাঝখানে একটা মন-কেমন-করা ব্যাকুলতা পাগল করে তাকে—মার এই বিরক্তি, এই তাড়াহুড়ো, এইটুকুতেই ধমক—কেমন যে একটা বুকচাপা কষ্ট দেয় কাউকে বোঝাতে পারে না, নিজেও যেন বোঝে না ঠিক। তাই একটুতেই আজকাল কান্না পায় তার, এতটুকু ত্রুটিতেই এতখানি রাগ হয়—মাকে দেখলেই বুক ঠেলে যেন কী-একটা দুঃখে মন ভরে যায়। মার হাতে আর কিচ্ছু করতে ইচ্ছে করে না—কিন্তু তার এই অভিমান, এই বেদনা মা বোঝেন না—তার কান্নাটাই দেখেন,

দাপাদাপিটাই দেখেন। এই সতেরো রকম ঝামেলা সেরে মেয়ের এই জেদ, অন্যায় অসভ্যতা বরদাস্ত করতে পারেন না তিনি— আশ্চর্য, যে-মা একদিন একটা ধমক পর্যন্ত দেননি, সেই মা-ই কেমন অকাতরে পটাপট চড় কসিয়ে দেন গালে!

আগে ঘুম ভেঙে উঠেই সে মাকে পেতো মার কোলে চড়েই সমস্ত সকাল কাটতো তার—চোখ খুলতেই হাসিমুখে হাত দু'টি মা বাড়িয়ে দিতেন তার দিকে, বলতেন, 'ফুটলো? আমার কমল কি ফুটলো এতক্ষণে?' কোলে নিয়ে আদর করতেন—তবু একটু কেঁদে নিতো সে, আর মা চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে-ছিটিয়ে তাকে হাসাবার চেষ্টা করতেন—'এট্টুখানি নামো তো বাবু!' কিছুতেই নামতো না তুলতুল—আর তুলতুলকে কোলে নিয়েই ছুটে-ছুটে মা দুধ গরম করে আনতেন—কোলে বসিয়ে টোষ্টে মাখন মাখিয়ে দিতে-দিতে গল্প করতে করতে ছোট চামচে দিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ডিম খাইয়ে দিতেন —সব কথাই মনে আছে তুলতুলের। আর, এখন? 'ওঠ, ওঠ, শিগগির ওঠ—ঈস, কী বেলাতেই উঠতে পারে মেয়ে!'—মার কথার সুর শুনলেই সমস্ত চিত্ত জ্বলে যায়, তক্ষুনি চীৎকার করে ওঠে সে—'না, উঠবো না তো—উঠবো না, উঠবো না, কিছুতেই উঠবো না।'

'ঘুম থেকে চোখ মেলেই আরম্ভ করলে?' মার গম্ভীর গলা। 'হ্যাঁ, করবো তো, বেশ করবো!' তুলতুল হাত দিয়ে-দিয়ে ঠেলে দেয় মাকে, বালিস তচনচ করে আর হাত-পা ছোঁড়ে মাকে কী কষ্ট দিতে পারে, কতখানি কষ্ট তার চিন্তায় অধীর হয়ে ওঠে।

বেচারা মা! সারারাত হয়তো ঘুমোতেই পারেননি তিনি বাচ্চার যন্ত্রণায়, সকাল না-হতেই তো আবার উঠতে হয়েছে—কী করবেন—ছেলেটা তো একেবারে পাখীর সঙ্গে জাগে—আর জেগেই তার

ক্রিয়াকলাপ—কখনও যদি একটু অসাবধান হয়ে পড়ে তাহলেই তো একেবারে কাঁথা—বালিস, এমনকি নিজের মুখ মাথাও চন্দনে মাখামাখি। পরিষ্কার টরিষ্কার করতে করতেই ছেলের চ্যাঁচানি খিদের তাড়নায়—জামা পরিয়ে, খাইয়ে, মুখ মুছিয়ে তবে ত অন্য কাজ? স্বামীর আপিস ন'টায়, তাড়াতাড়ি তিনি ছুটলেন চায়ের যোগাড়ে, চায়ের পাট তুলে তাড়াতাড়ি চাকরকে বাজারে পাঠানো—ঝি-টি তো নবাবনন্দিনী—একবার যাচ্ছেন, আর এক বার আসছেন—কখন তার শরীর ভাল থাকবে আর খারাপ হবে তার ঠিক কী—অতএব ঘরদোর ঝাঁটপাটের ব্যবস্থা করতে হয়, বিছানা বালিস রোদে দিতে হয়;—আসে বাজার, ছোটেন রান্নাঘরে—ইতিমধ্যে হয়তো পুত্ররত্নের মর্মভেদী চীৎকারে পাড়া পাগল। এত সবের মধ্যে চার বছর পূর্ণ পাঁচ বছরের বুড়ো মেয়েও যদি এটুকু ছেলের সঙ্গে কান্নার প্রতিযোগিতা করে তো রাগ ধরে না? একবার দু'বারের পরেই তিনি ধৈর্য হারান, তুলতুলের কোমল গাল তাঁর হাতের স্পর্শে লাল হয়ে ওঠে।

আস্তে আস্তে নিরুপায় তুলতুল বাবার দিকেই ঝুঁকে পড়লো শেষে। মার ব্যবহার, মার এমন অকারণ নিষ্ঠুরতা তার ছোট্ট হৃদয়কে যেন ভেঙ্গেচুরে দিলো; অগত্যা বাবাকেই আশ্রয় করলো তাকে বুকের মধ্যে? চাঁদের গল্প বলেন? ঘুম পাড়ান গান গেয়ে? ওপাশে কেবল ঘুরে-ঘুরে শোন ভাইয়ের দিকে, যদি সে টানাটানি করে বেশি তক্ষুনি বলেন, 'বাবা রে বাবা, শান্তিমতো একটু শুতেও দিবি না তুই?' তারপর ফেরেন বটে—কিন্তু সেই ফেরায় কতটুকু মন দেন যে তুলতুলের মন ভরবে? বাবাই ভালো—কত সুন্দর মিষ্টি কথা বাবার, কত ভালো ভালো গল্প জানেন—কেমন সুন্দর তার দিকেই ফিরে থাকেন সারাক্ষণ—তার নরম-গালে টোকা দেন—চুমু দেন—

তুলতুলকে বলতেও হয় না সেজন্য। বাবার কালো-কালো ঘন চুলের মধ্যে সেও তার ছোট আর লালচে আঙুল ডুবিয়ে আদর করে—গলা জড়িয়ে ধরে—মার অভাবের ফাঁকা-বুকটা ভরে নিতে চায় বাবার ভালোবাসায়।

এতক্ষণে তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছো—তুলতুলটা কী রে! ভাইকে হিংসে করে! তা কিন্তু ঠিক কথা না। ভাইকে খুব ভালবাসে সে,

ভাইয়ের হাত-পা নাড়া দেখতে দেখতে, একগাদা থুতু ছিটানো বুড়বুড় করে ভাষাহীন কথার আওয়াজ শুনতে শুনতে আহ্লাদে গলে যায়। আর আজকাল এমন হাসতে শিখেছে, আর দুষ্টুও কি কম নাকি—এর মধ্যেই কি সুন্দর দিদি বলে, পষ্ট শুনতে পায় তুলতুল। দুদদু, দুদদু—দিদ্‌দি দিদ্‌দি, এ আর কে না বোঝে যে তুলতুলকেই ডাকছে সে। মুখ তার গম্ভীর হয়ে ওঠে, চোখের পাতা দস্তুরমতো ভারি হয়ে যায় - গলার সুরটা ঠিক মার মতো করে বলে, 'কী রে বল না ডাকিস কেন? কিংবা, ছি বাবুন, দিদিকে কি এমন করে দিনরাত বিরক্ত করতে হয়—দেখছো না আমি কাজ করছি এখন?'

বাবার সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে, ভাইকে অসম্ভব ভালোবেসে—মায়ের অনাদরটা যখন প্রায় সহ্য হয়ে এলো—ততদিনে তুলতুলের ভাই বাবুইও বেশ মানুষের মতো হয়ে উঠলো। নিচে উপরে তার পাঁচটা চকচকে সাদা দাঁত উঠেছে, আর সেই দাঁতে কী জোর! নতুন খাটটা কামড়ে-কামড়ে এতখানি খেয়ে ফেলেছে সে। খাটো জাঙিয়া পরে, হাতকাটা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে ধরে-ধরে বেশ একপা দু'পা হাঁটে এখন, মা বলতে পারে, বাব্‌বা বলে—আর দিদি ত কবেই শিখেছে। দিনরাত সে হামি করছে সকলকে, যে যত দূরেই থাক না কেন, মা যদি বলেন, 'বাবুন, এত্‌তু হামি করে দাও তো'—আর কথা নেই ঐখান থেকেই সে ঠোঁট গোল করে হামি করে দেবে। তুলতুলকে বলে 'তুতুন্‌'—বাড়ির চাকর গোবিন্দকে বলে, 'গনন্‌' আর যেই বাবা আপিস থেকে আসবেন, দু'হাত বাড়িয়ে ঝুঁকতে থাকবে কাছে যাবার জন্যে—'নন্‌নে নেন্‌নে'—আগে-আগে নিতেন না বাবা। মেয়েই তাঁর প্রথম, মেয়েই তাঁর প্রধান—সেখান কি আর কেউ? মেয়ে নিয়েই তাঁর যত আদর। অমন মেয়ে কি সারা পৃথিবীতে আর

জন্মেছে নাকি? এত সুন্দর আর কার চুল? কার চোখ? এত বুদ্ধি কার?

আপিস থেকে বাবা কখন ফিরবেন এই আশায় বেলা পড়তেই তুলতুল দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তার ধারের বারান্দার শিকের ফাঁকে চোখ রেখে, কিন্তু বাবুই একটু বড়ো হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বাবার সেই একাগ্রতায়ও যেন চিড় খোলা একটু! ভাইকে বাবা কোলে নেবেন, আদর করবেন, তা নিয়ে তো তুলতুলের অভিযোগ নেই—অথচ অভিযোগটা যে কী তাও জানে না স্পষ্ট করে। যেমন মা একদিন ভাইকে পেয়ে ভুলে গিয়েছিলো তাকে সে অনুভব করলো, বাবাও যেন ঠিক তেমনি হয়ে যেতে লাগলেন আস্তে-আস্তে। আবার বুক ভারি হয়ে উঠলো তার, মন ভার। এখন বাবা তার বুদ্ধি দেখে অবাক্ হন না, তার কোন কথা, কোন কাজই আর বাবাকে হতবাক করে দেয় না আগের মতো, আর ভাই যে একটু সামান্য পা ফেলে হাঁটে, কাজের জিনিস চিবিয়ে নষ্ট করে রাখে, চুরি করে বারে-বারে লজেন্সের শিশির কাছে যায়, তাই নিয়ে কি অবাক হবার ধুম! আশ্চর্য! ভাই যখন কথা কপচায়, বাবা বলেন, 'দেখ, দেখ, এখুনি কেমন কথা বলবার চেষ্টা!' ভাই যখন বাবার কাজের বই ছিঁড়ে দিয়ে পালিয়ে আসে তখন বলেন, 'ও মা, কি দুষ্টুরে? কেমন বুদ্ধি করে আবার পালিয়ে যাচ্ছে!' সেদিন কেমন হামা দিয়ে গিয়ে ভাঁড়ার ঘরে আম চুরি করে খাচ্ছিলো—নাকে মুখে পেটে—কী একখানা রূপ খুলেছিলো সব, গায়ে আমের রস লাগিয়ে—যেই মাকে দেখতে পেলো, অমনি হাত বাড়িয়ে কুটিকুটি পাঁচখানি দাঁত বের করে একগাল হাসি—'নেন্‌নে—কাক্‌কা—মা—কা!' 'দুষ্টু, এই করছো চুপে-চুপে বসে! আবার আমাকে আম সাধা হচ্ছে, কা—কা তোর

মতো পেটুক নাকি রে আমি যে খাবো !'—ছুটে গিয়ে সেই রসমাখা বাবুইটাকে কোলে নিয়ে মার কী চুমু—'ছাখো, শোনো'—বাবার কাছে এসে বাড়িয়ে-বাড়িয়ে আরো যে কত-কিছু বুদ্ধির কথা মা জানালেন হাসতে-হাসতে তার ঠিক নেই—তুলতুলের সেদিন রাগে একটা চড় মারতে ইচ্ছা হয়েছিলো ভাইকে ! ভারি একটা করেছে, তার আবার বাহাদুরি কত ! ও-রকম জামা নষ্ট করে তুলতুল আম থাক তো—আগুন হয়ে যাবেন না মা—'আবার জামা নোংরা করেছো, ভালো করে খোতে পারো না ?' না, পারি না, নোংরা করবো তো, একশোবার করবো, বেশ করবো ! মা-বাবারা কেমন করে এতো খারাপ হয়ে যায়—কেন এমন একচোখো হন—দরজার কোণে বসে বসে ছলোছলো-চোখে অনেকক্ষণ সে-কথা ভেবেছে তুলতুল !

আগে সকালবেলা ঘুম ভেঙে উঠতেই সে বাবার গলা জড়িয়ে ধরতো —বাবা ফিরে চেয়ে আদর করতেন তাকে—এখন ভোর না-হতেই বাবুইটা এসে হাজির হবে বিছানায়—ঐটুকু খাটে তিনটে লোক ধরে নাকি ? তুলতুল যে আপত্তি করে তা কি এতই অন্যায় যে, অমনি মা বলে উঠবেন, 'আচ্ছা, তুলতুল—অতটুকু ভাইটাকে তোর এত হিংসে কেন রে ?' আর মার কথা শুনলেই রাগে অস্থির হ'য়ে যায় তুলতুল —'হ্যাঁ—বেশ করবো, হিংসে করবো !' তক্ষুনি সে এক ধাক্কায় বাবার বুকের উপর থেকে ফেলে দেয় ভাইকে। বাবা আদর করে তাকে তুলে নেন, তারপর গম্ভীর গলায় বলেন, 'ছি, তুলতুল !' ঐটুকু বলাই যথেষ্ট—তুলতুলের বুক ভেঙে যায়।

আপিস থেকে বাবা কখন ফিরবেন এই আশায় যখন আগে-আগে বসে থাকতো তুলতুল, বাবা এসেই জামা জুতো না ছেড়েই কোলে নিতেন তাকে—ছোট-ছোট মুঠি ভরে দিতেন বিস্কুট আর

লজেন্স! বাবুইটা এত পাজি, ঠিক সময়মতো সে-ও আজকাল বেশ বাবার আশায় ঘুরঘুর করতে শিখেছে সিঁড়ির মুখে—তুলতুল যতই তাকে ঠেলে দেয়, ততই সে হাসে আর বলে, 'বাবা আব্বে, বাবা-ও বাবা বিকু দেয়,' আর যেই বাবার জুতোর আওয়াজ পাবে, একেবারে যেন ময়ূরের মতো আনন্দে নাচতে থাকবে-- আর দেখলে কি কথা আছে—ঝাঁপিয়ে পড়বে কোলে—সাধ্য কী, তার আগেই তুলতুল দেখা করে বাবার সঙ্গে। ছোট-ছোট মোটা-মোটা হাত দিয়ে গলা জড়াবে—মুখে একগাদা থুতু মাখিয়ে আদর করবে—আর বাবাও তক্ষুনি গলে যাবেন ছেলের আদরে—আর, এদিকে তুলতুল যে কত ভদ্র, কত সভ্য হয়ে, কত আশা করে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে আর খেয়ালই নেই! একদিন টিঁকতে না-পেরে সে-ও ভাইয়ের মতো করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো বাবার গায়ের উপর। ভাইকে নিয়ে পড়ে যেতে-যেতে কোনরকমে টাল সামলে নিলেন তিনি, তারপর রাগ করে বললেন, 'কী যে অসভ্য হচ্ছো তুমি দিন-দিন, পড়ে যেতাম যদি? এত বড়ো হয়েছো—বোঝো না?' বড়ো, বড়ো, কত বড়ো হয়েছে সে? কবে বড়ো হয়েছে? নিজেরা এখন দেখতে পারে না কিনা, তাই সবটাতেই দোষ, আর ভাইয়ের সব ভালো। দুঃখে ক্ষোভে ফেটে গেলো তুলতুল। তখন তো কাঁদলোই--অযথা আবদার করে সারাটা সন্ধ্যাও সে কাঁদলো, আর সারাটা সন্ধ্যা তেমনি বকুনিও খেলো—তারপর ঘুমিয়ে পড়লো না-খেয়ে।

শেষে হতে-হতে এমন হলো যে দিনে-রাতে এমন একটি মুহূর্ত যায় না যখন কোনো-না-কোনো একটা যন্ত্রণা লেগেই আছে তুলতুলকে নিয়ে—অস্থির অধীর দাপাদাপির একটা ছোট্ট যন্ত্রই যেন হয়ে গেল সে। ভালো দাও, মন্দ দাও, সব কিছু সে মিলিয়ে দেখবে ভাইয়ের

সঙ্গে, দুটো যদি জামা আনলো দু'জনের জন্য—আর তার নিজেরটা যদি হাজারও দামী হয়, সুন্দর হয়, তবুও ভাইয়ের জামাটা একশোবার খুঁটে-খুঁটে দেখবে আর বলবে, এটাই বেশি সুন্দর, এটাই ভালো। উপায় নেই। ছোট বলে যে বাবুইকে একটা খেলনা কিনে দেবে, একটা খাবার এনে দেবে, তাহলে তো বাড়ি একেবারে তোলপাড়। মা-বাবা গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলেন মেয়ের কথা। মারো, কাটো, শাসন করো, আদর করো,—কিছুতেই আর শোধরাবার নয় সে। ঘুম থেকে উঠে আরম্ভ হলো বায়না, আর শেষ হলো রাত দশটায় যতক্ষণ না ঘুমে ঢুলে পড়লো।

তার ছোটো মনে এ-ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেলো যে, তাকে কেউ ভালোবাসে না, কেউ দেখতে পারে না! তার নিজের কিছুই দোষ নেই—খামকাই সকলে মিলে তাকে বকে, মারে। সে রোগা হয়ে গেলো, বিচ্ছিরি হয়ে গেলো, কাঁদতে-কাঁদতে গলার আওয়াজ এমন বদসুর হলো যে, তার নিজের কানেই বেসুরো লাগতে লাগলো ভালো হবার চেষ্টা যে সে করে না তা নয়, কিন্তু এমন ভালোবাসাহীন বাড়িতে কি মানুষ ভালো থাকতে পারে?

শেষে এই মনের কষ্টে-কষ্টে অসুখ করলো তার। প্রথম দিন গা গরম-গরম হলো একটু, দ্বিতীয় দিন একটু বেশি, আর তৃতীয় দিন একেবারে বেহুঁশ। মা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে মেয়েকে কোলে নিয়ে বসে রইলেন সারাদিন, বাবা আপিস কামাই করলেন, আর বাবুই কোথায়-কোথায় কেঁদে-কেঁদে ঘুরে বেড়াতে লাগলো সারাদিন ঝিয়ের কাছে। তুলতুল জ্বরে-ভরা শরীর নিয়ে নির্জীবের মতো পড়ে রইলো চোখ বুজে। কিন্তু তার জ্ঞান ছিলো,—মার এই নিবিড় সান্নিধ্য এত কষ্টের মধ্যেও যেন অনেক শান্তি দিলো তাকে। সাতদিন একই ভাবে

রইলো তার জ্বর, আর সাতদিনের মধ্যে মার নাওয়া-খাওয়া-ঘুম—ভাইকে কোলে নেওয়া—কিছুই আর রইলো না একমাত্র তুলতুল ছাড়া। দিন-রাত ঝুঁকে আছেন তিনি মুখের উপর, জাপটে তুলে নিচ্ছেন তাঁর সুন্দর গন্ধ-ভরা বুকের মধ্যে। 'তুলতুল' আমার সোনা, আমার বাবা, আমার মণিটা'—গলার স্বর যেন ঠাণ্ডা মিষ্টি হাওয়ার মতো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে তুলতুলের যন্ত্রণাকাতর রুগ্ন দেহকে। আর, বাবা? পিছনে হাত দিয়ে পাইচারি করছেন তিনি সারারাত—এক-একবার দাঁড়াচ্ছেন এসে মাথার কাছে—একবার ছুটছেন ডাক্তারের বাড়ি, আবার যাচ্ছেন ওষুধ আনতে—কখনো একেবারে কাছে এসে ভারিগলায় ডাকছেন, 'আমার মা-মণি—আমার সোনা।'

মা-বাবার ব্যবহার দেখে তুলতুল একেবারে অবাক্। তবে কি তাঁরা এখনো ভালোবাসেন তাকে? কই, তুলতুল তো কক্ষনো বোঝেনি আগে এ-কথা। তবে কি এতদিন তারই ভুল ছিলো? দোষ কি তবে তারই? জ্বরে দুটি আরক্ত চোখ মেলে বারে-বারে সে তাকাতে লাগলো তাঁদের মুখের দিকে। ছোটো মানুষ, ভালো করে ভাবতে পারলো না সব কথা, কেমন যেন কান্না পেলো তার। শরীরের অত কষ্টের মধ্যেও একটা স্নিগ্ধ আনন্দে মন ভরে গেলো।

ডাক্তার এসে বললেন, 'আশ্চর্য, কাল থেকে আজ যে অনেক ভালো—প্রায় তুলনাই হয় না!'

মা-বাবার মুখে এই ক-দিনের মধ্যে এই প্রথম হাসি ফুটলো ডাক্তারের কথা শুনে। এই প্রথম মা তার বিছানা থেকে উঠে গিয়ে ভালো করে মুখটুক ধুয়ে এলেন। বাবা সেদিন আপিসে গেলেন অনেক শান্ত-মনে।

আর, তুলতুল? তুলতুল সারাদিন একটুও বিরক্ত করলো না

মাকে, ওষুধ খেতে কষ্ট হলো ; তবু খেয়ে নিলো নিঃশব্দে—মা-র খাবার সময় আঁচল চেপে বসিয়ে রাখলো না জেদ করে—আর রাত্রিবেলা চোখ বুজে ঘুমুবার চেষ্টা করলো এই ভেবে যাতে মা-বাবাও একটু ঘুমুতে পারেন।

আর যেদিন সকালে তার জ্বর ছাড়লো সেদিন ছোট-ছোট রোগা-হাতে ভাইকে সে টেনে নিলো বিছানায়, তার কচি-কচি নরম গালে চুমু খেয়ে বললো, ভাই, তুমি মিট্টি—তুমি ভা-ও। বিজ্ঞের মতো বাবুইও মাথা তুলিয়ে প্রতিধ্বনি করলো, 'ব-ই মিট্‌টি—দিদ্‌দি বা-ও।'

দুই বোন

টুলু দিদি-অন্ত প্রাণ। ঝগড়া কিন্তু ততোধিক। একদণ্ড যেমন দিদি নইলে চলে না—আবার একদণ্ড সে ঝগড়া না-ক'রেও থাকতে পারে না। এমনিতেই তো দিদি যে তার চাইতে অনেক বড়ো তাই নিয়েই তার পরম অভিমান—তার উপরে দিদির কত বিদ্যে। বগলে ব্যাগ ঝুলিয়ে সে ট্রামলাইন পেরিয়ে একা-একা ইস্কুল যায়, মোটা-মোটা ছবিওলা বই পড়ে—সমবয়সী বেণীঝোলানো বন্ধুদের সঙ্গে আড়ি করে, ভাব করে—পাঁচ বছরের টুলু তার দশ বছরের দিদির এই সব অসাধারণ কীর্তি দুই চোখ বিস্ফারিত করে দেখে, শোনে, শেখে, আর ঈর্ষায়, ভক্তিতে, ভালোবাসায়, বিরক্তিতে হৃদয়ের মধ্যে একটা কেমন যন্ত্রণা উপভোগ করে। কখনো-কখনো তার লাবণ্যভরা টুলটুলে মিষ্টি মুখে হাসি আর ধরে না, কখনো-কখনো ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া ঘন আর কালো চুলের তলা থেকে তার ততোধিক কালো বড়ো-বড়ো দুই চোখে একটুও জল না-এলেও চীৎকার করে বাড়ি মাথায় করে। মাঝে-মাঝে অবিশ্যি বুলু ভীষণ চটে যায় তার ব্যবহারে, ঠাস্ করে একটা চড়ও মারে কখনো-কখনো, কিন্তু সে খুব কম। বেশির ভাল সময়েই ভারি ভালো লাগে তার ছোটো বোনের ভাব-ভঙ্গী দেখতে। ফোলা-ফোলা গালে নিজের কমফোলা দশবছরের কচি গাল ঠেকিয়ে—আদর করতে করতে বলে, 'দুষ্টুটা, হিংসুটিটা'···আর টুলু দিদির সেই আদরে গা ঢেলে দিয়েও যেন আদর চায় না এমন একটা ভঙ্গিতে দিদিকে ঠেলে দিয়ে বলে, 'যাও তুমি, ভালো না, তুমি দুষ্টু, তুমি হিসকুটি'···

দিদি যখন ইস্কুলে যায় ভারি কষ্ট হয় তার। সারাটা দুপুর আর কাটতে চায় না। এদিকে ঘুমিয়ে থাকবার মতোও ছোটো না, ইস্কুলে যাবার মতোও বড়ো না—ভারি মুশকিল হয়। মা তো খেয়েই ঘুম—বাবা আপিস—সে কী করে? কেবল খিদে পেতে থাকে। ঘুমন্ত মাকে বারে-বারে বিভক্ত করে, দু-একবার ঘুমে ভরা চোখ মেলে মা তাকান, আবার ঘুমিয়ে পড়েন। বিরক্ত করে বলে মা আজকাল বুলুর টিফিনের সঙ্গে টুলুকেও একপ্রস্থ খাওয়ান—কিন্তু তাতে কী, টুলুর আবার খিদে পায়। ঘড়ি দেখতেও জানে না যে বারে-বারে সময় দেখবে—সারাদিন ঘুরঘুর করে ছোটো বাড়িটাতে ঘুরে বেড়ায়—কাজে-অকাজের আবর্জনায় গন্ধমাদনের সৃষ্টি করে ঘরে ঘরে—নিজের পুতুলগুলোকে একবার শোওয়ায়, একবার বসায়—বারে বারে ন্যাতা ভিজিয়ে ঘর মুছে ভাসিয়ে দেয়—বাবার টেবিল ঘাঁটে, দিদির পরিত্যক্ত পেন্‌সিল কাগজ নিয়ে বিজ্ঞের মতো লেখাপড়া করে আর তারপরে দক্ষিণের বারান্দা থেকে রোদ সরে গিয়ে যখন কোণাকুণি দাঁড়ায়, তখন রাস্তার ধারের ছোটো সরু বারান্দায় বসে পা দুলিয়ে গান গায় আর দিদির প্রতীক্ষায় ব্যাকুল দৃষ্টি ফেলে রাখে রাস্তার উপর। দূরে দিদির লাল ছাতাটি দেখতে পেলেই আনন্দে লাফিয়ে ওঠে সে—চীৎকার করতে থাকে, 'দিদি, শোনো···মা আমাকে আজ তোমার চাইতে বেশি খেতে দিয়েছে, বাবা আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে···তোমাকে নেবে না···আমি দুটো পান খেয়েছি···' দিদির ঈর্ষা উৎপাদন করবার যা-যা বুদ্ধি তার মাথায় খেলে সব ক'টাই সে প্রয়োগ করতে থাকে। দূর থেকে দিদি একটু-একটু হাসে—টুলুর সারা শরীর জ্বলিয়ে যায়। তারপর দু'বোনকে মা খাবার ঠিক করে দেন—খেতে-খেতেও সে দিদির সঙ্গে ঝগড়া না করে পারে না—সন্দেহাকুল দৃষ্টিতে

দিদির বাটিটার দিকে এক নজর দেখেই আন্দাজে কেঁদে ওঠে—'আমি খাবো না, আমার কম, দিদির বেশি।' মা ধমক দেন—কিন্তু কে শোনে কার কথা। বুলু মেজাজ খারাপ করে বলে, 'এক থাপ্পড় মারবো। খেলায় নেবো না তোকে—ভারি আহ্লাদি হয়েছিস, না?' টুলু তক্ষুনি ধরাশায়ী। শুধু ধরাশায়ীই না—একেবারে শোবার ঘরের খাটের তলায়। কথায়-কথায় তার রাগ লেগে আছে—আর রাগলেই খাটের তলা। মা বিরক্ত হয়ে বলেন, 'এলি দুষ্টু মেয়ে? সারাদিন ঝগড়া আর ঝগড়া—'

খাটের তলা থেকেই কান্নাবিজড়িত গলায় সে জবাব দেয়—'দিদি দুষ্টু, মা দুষ্টু, বাবা দুষ্টু, আমি ভালো—'

বুলু মা'র দিকে তাকিয়ে হাসে, মা বলেন, 'যা একটু ডেকে আন ওটাকে, সারাদিন জ্বালিয়ে দিলো আমাকে।'

বুলু বলে, 'থাক গিয়ে, যেমন পাজি তেমনি শাস্তি হোক—হিংসুটি...'

'না লক্ষ্মী তো—এই দেখ এই খাবারগুলো নষ্ট হয়ে গেলো—তুমি তো ওর দিদি—তুমি তো লক্ষ্মী দিদি।' মা আদরের সুরে বলেন। টুলু মুখে 'না না' বলে, কিন্তু ওর দশ বছরের মেয়ে-মনও কোথায় যেন স্নেহের আস্বাদে ভরে ওঠে। প্রথমটা গলা চড়িয়েই ডাকে, 'নে, আর, খেয়ে নে—দুষ্টু মেয়ে...'

'না, আমি আসবো না।'

'তবে কিন্তু মঞ্জুদের ছাতে খেলতে নেবো না।'

এইবার টুলুর ছোটো মাথা খানিকটা বেরিয়ে আসে খাটের তলা থেকে—কিন্তু মুখে বলে, 'না নিলে!'

'ঠিক?'

'আমি কী জানি !'

'তবে খেতে আয় ।'

'আমাকে না-সাধলে আমি খাবো কেমন করে ?'

বুলু চেঁচিয়ে হেসে ওঠে। বুলুর মাও। তারপর হাত বাড়িয়ে তিনিই কাছে টেনে এনে চুমু খেয়ে খেতে বসান। বুলু জামা পরিয়ে, মাথা আঁচড়ে নিয়ে যায় নিজের সঙ্গে খেলতে।

এই করে-করে দিদির ছায়া হয়ে ঝগড়ায় আর সুগভীর ভালোবাসায় টুলু বড়ো হয়ে উঠলো। একসঙ্গে ইস্কুল যাওয়া একসঙ্গে খাওয়া একসঙ্গে বেড়ানো, এক বিছানায় পাশাপাশি শোয়া—একেবারে নিরবচ্ছিন্ন দু'জন সঙ্গী। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে বুলু যে-বছরে কলেজে ভর্তি হলো--টুলু গর্বিত হলো খুব। দিদি সকালবেলা উঠেই কী সুন্দর শাড়ী পরে ট্র্যামে চড়ে কলেজে চলে যায়—এ-দৃশ্য কি অবহেলা করবার ! কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে একটা বিচ্ছেদের কষ্টও অনুভব করলো সে। বুলু যখন ফিরে আসে তখন তার ইস্কুল যাবার সময়, কাজেই দুপুরটাও দু'বোন দেখা হয় না। ইস্কুলটাই বিস্বাদ হয়ে গেলো টুলুর কাছে। যে-ইস্কুলে যাবার জন্য তার গরজের অন্ত ছিলো না—আজকাল কোনো অছিলায় সে-ইস্কুলই তার কামাই করতে ইচ্ছে করে। অবিশ্যি আস্তে-আস্তে তার অভ্যেস হয়ে এলো এই বিচ্ছেদ—আর তারপর একদিন সেও তো কলেজে যাবে এই কথা ভেবেই মনে-মনে অনেকটা শান্ত হলো।

কিন্তু এর মধ্যেই বাড়িতে একটি নতুন আবহাওয়া দেখা দিল যেন। দু'চারজন অপরিচিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার আনাগোনা—মা বাবার সহাস্য অভ্যর্থনা, দিদির সলজ্জ চেহারা—সবটা মিলিয়ে অন্য রকম একটা-কিছু ভাবতে-ভাবতেই সে খবর জানলো—দিদির বিয়ে।

রাত্রিবেলা ঘুমুতে এসে টুলু বললো, 'দিদি, তোর বিয়ে ?'

বুলু জবাব দিল না। উশখুশ করে টুলু আবার বললো, 'বিয়ে খুব মজার—কিন্তু বিয়ে হলে যে চলে যায়। তুইও যাবি ?'

ছেলেবেলা থেকেই বুলু যেমন, গম্ভীর আর বড়োসড়ো—টুলু তেমন ছেলেমানুষ। এই বারো বছর বয়সেও তার মুখে শিশুর আভা। বুলু ছোট বোনের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বুকের মধ্যে একটা কষ্ট অনুভব করলো। এই বিয়ের ব্যাপারে তার নিজের মনটা ভালো লাগছিলো না, টুলুর কথা শুনে আরো কেমন হয়ে গেল। চুপ করে শুয়ে রইলো বিছানায়। জবাব না-পেয়ে অভিমান হলো টুলুর—রাগ করে দিদির গায়ে ঠেলা দিলে বললো, 'আচ্ছা, বেশি অহংকার কোরো না···ভেবেছো বুঝি এক তোমারি বিয়ে হলো এ-সংসারে···একদিন আমারো হবে···তখন আমি তোমার সঙ্গে কথা বলবো না।'

হেসে ফেললো বুলু, দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো টুলুকে, আদর করে বললো, 'আচ্ছা।'

দিদি আদর করলে এখনো ছেলেবেলার মতো অনুভূতি হয় টুলুর। বুলুর গায়ের উপর আলগোছে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে ভারী গলায় বললো—'সত্যি তুই আমাকে ছেড়ে চলে যাবি নাকি বল না ?'

'পাগল নাকি ! আমি কি তোকে ছেড়ে একবেলাও থেকেছি ?'

'বিয়ে হলে তো শ্বশুরবাড়ি চলে যায়—'

'আমি যাবো না।'

'তাই ভালো—' আশ্বস্ত হয়ে বুলু উঠে বসলো। একটু শান্তি পেলো মনের মধ্যে।

এদিকে বিয়ে ঠিক হবার অল্পদিনের মধ্যেই বাড়িতে একটা ব্যস্ততার সাড়া পড়ে গেলো। মা ব্যস্ত, বাবা ব্যস্ত, আসছে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-

কুটুম্ব·····বুলুও যেন কেমন উন্মনা·····মাঝে-মাঝে মাকেও সে নির্জনে এ-জানলায় ও-জানলায় বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে—টুলুর মন-কেমন করে। শুকনো মুখে আরো জড়িয়ে থাকে দিদিকে—একদণ্ড ইচ্ছে করে না চোখের আড়াল করতে। তারপর একদিন সকালবেলা সানাই বেজে উঠলো, আর রাত্রিবেলা আলো জ্বালিয়ে বাজনা বাজিয়ে দিদির বিয়ে হয়ে গেলো একজন যুবকের সঙ্গে। ফরসা ছিপছিপে ছেলেটি। গরদের ধুতি পাঞ্জাবি পরে ফুলের মালা গলায় দিয়ে তাকে ভালোই দেখাচ্ছিলো দিদির পাশে—'। আর দিদি! দিদির দিকে তাকিয়ে টুলু একবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। চন্দনে কাজলে বিধুরতায় মধুরতায় মাখামাখি সে-মুখ—টুলুর শিশু মনেও দোলা লাগলো। অনেক রাত্রে লগ্ন ছিলো বিয়ের—কাজেই অধেক বিয়ে দেখেই একগাদা কাপড়ের উপর ঘুমিয়ে পড়লো টুলু। সেদিন আর রাত্রিতে দিদির সঙ্গে একঘরে শোবার এই প্রথম বিচ্ছেদটা তাকে ভোগ করতে হলো না। পরের দিন সকালে উঠে বাড়ির চেহারা দেখে সে অবাক হয়ে গেলো। এদিকে বিয়ের অনুষ্ঠান, অন্যদিকে বিদায়ের আয়োজন। দুই চোখের জলে ভাসতে-ভাসতে মা ট্রাঙ্ক গুছোচ্ছেন, স্থাণুর মতো বসে আছেন বাবা। আর দিদি যেন ঠিক একটি কলের পুতুলের মতো সব অনুষ্ঠান করে যাচ্ছে—স্বল্প ঘোমটার ফাঁক দিয়ে তার জলভরা চোখ দেখে টুলু হঠাৎ কেঁদে ফেলে ছুটে পালিয়ে গেলো সেখান থেকে। কেউ তাকে লক্ষ্য করলো না, কেবল বুলু একবার মুখ তুলেই চঞ্চল হয়ে উঠলো খসখসে বেনারসীর আড়ালে।

আংটি-খেলা, চাল-খেলা—শতকোটি অনুষ্ঠান সেরে যে-মুহূর্তে ছাড়া পেলো—ছুটলো সে বোনের খোঁজে। ঘুরে-ঘুরে তেতলার

চিলকুঠির ছাতে পাওয়া গেলো তাকে। মাটিতে গড়িয়ে-গড়িয়ে শিশুর মতো কাঁদছে সে। বুলু গলা দিয়ে একটি আওয়াজ বার করতে পারলো না—এক গা গয়না নিয়ে—একরাশ কাপড়ের স্তূপ নিয়ে সেও দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠলো অসহায়ের মতো। কিন্তু এই নিদারুণ বিচ্ছেদের দিনেও তার মন খুলে কাঁদবার সময় কোথায়? আধ ঘণ্টার মধ্যেই আত্মীয়-স্বজনরা তাকে খুঁজে পেতে ধরে নিয়ে গেল নিচে। এক্ষুনি যেতে হবে—আর তার মধ্যেই তো সারতে হবে সব!

বিদায়ের সময় উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাতে লাগলো বুলু! টুলু? টুলু কই? বাবা এলেন আশীর্বাদ করতে—তাঁর দুই পায়ের মধ্যে মাথা গুঁজে সে ফুঁপিয়ে উঠলো—ক্রন্দনমুখী মাকে ধরে নিয়ে এলেন কোনো আত্মীয়া—তিনি আশীর্বাদ-বাক্য উচ্চারণ করতে পারলেন না, দুই স্নেহ-ব্যাকুল আলিঙ্গনে মেয়েকে বুকের মধ্যে সাপটে নিলেন শুধু। তারপর একে-একে সবাই এলো—এলো না টুলু। উলু দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে, চিরকালের মতো এ-বাড়ি থেকে পর করে দেওয়া হলো বুলুকে—গাঁটছড়া বেঁধে আবাল্যের আবাস ছেড়ে, মা-বাবাকে কাঁদিয়ে,—ছোটো বোনকে চোখের আড়াল করে মোটরে চড়ে সে চলে গেল শ্বশুরবাড়ি।

আবার-কিন্তু দু'দিন পরেই ফিরে এলো সে তার সেই পরিচিত অভ্যস্ত আবাসে। আনন্দে ঝলমল করতে-করতে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলো দুই বোন। তাদের দু'জনের চোখের জল মিলিত হলো হাসির রেখায়। আত্মীয়-কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব সকলের চোখ ছলছল করে উঠলো দৃশ্য দেখে। তারপর অষ্টমঙ্গল পর্যন্ত চারটে দিন টুলু একেবারে দিদির নয়নের মণি হয়ে কাটালো। তাছাড়া ভগ্নীপতিকে

তার বেশ ভালোই লাগছিলো। চমৎকার ভদ্রলোক—সারাক্ষণ দুষ্টুমি করে তার সঙ্গে, দিদির বদলে তাকে নিয়ে চলে যেতে চায়, আরো যে কী সব মধুর ঠাট্টা করে, ভালো করে বোঝে না টুলু, কিন্তু রোমাঞ্চিত হয়।

কিন্তু এ-স্বপ্ন তো মাত্র চার দিন। আবার বুলু চলে গেলো সকলকে কাঁদিয়ে। এবার শুধু বুলুই গেলো না, আত্মীয়-কুটুম্ব সবাই চলে গেলো বাড়ি খালি করে। বুলুহীন বাড়ি যে কী মর্মান্তিক-রকমের শূন্য, সে-কথা এ-বাড়ির তিনটি প্রাণীই সমান উপলব্ধি করে যেন ক'দিন পাগলের মতো হয়ে রইলো। জীবনের সব আনন্দ নিংড়ে চলে গেছে বুলু। তবু বিচ্ছেদ দিয়ে ভরা দিনগুলিও ধীরে-ধীরে কাটতে লাগলো। একদিন, দু'দিন, তিনদিন করে-করে একমাস কেটে গেল। একদিন অন্তর চিঠি লেখে বুলু, টুলু একবার প্রকাশ্যে চেঁচিয়ে, একবার মনে-মনে, আর অজস্র বার লুকিয়ে-লুকিয়ে সেই চিঠি পড়ে—হয়তো মাও তাই—টুলুর মনে হয়, বাবাও তাই করেন। আস্তে-আস্তে বাড়ির বিষাদময় আবহাওয়া অনেকটা হাল্কা হয়ে এলো। আস্তে-আস্তে বুলুর অভাবে অভ্যস্ত হয়ে এলো তারা। তারপর টানা ছ-মাস যথারীতি সংসার চলবার পরে হঠাৎ খবর এলো, বুলু আসছে। ইস্কুল থেকে ফিরেই খবরটা পেলো টুলু। আহ্লাদে সে ভালো করে খেতে পারলো না, বসতে পারলো না স্থির হয়ে ক্রমাগত মার গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগলো। রাত্রিতেও ঘুম হলো না ভালো—জেগে ঘুমিয়ে কেবল দিদির স্বপ্নই দেখলো সে। পরদিন থেকে আর মন নেই কিছুতে। না স্কুল, না বাড়ি, না বন্ধু-বান্ধব, না গল্পের বই—কেবল ক্যালেণ্ডারে তারিখ গোনে আর বিড়বিড় করে দিন আওড়ায়।

মা হেসে বললেন, 'তুই দেখছি, পাগল হয়ে গেলি রে!' লজ্জা পেয়ে টুলু জবাব দেয়, 'মোটেও না। দিদি যে আসবে সে-কথা আমার মনেও থাকে না।'

অবশেষে এলো সেই বাঞ্ছিত দিন। বাড়ি-ঘর গুছিয়ে আর বাকি রাখলো না টুলু। যেখানে সে দিদির সঙ্গে ঘুমুতো সেখানটা একেবারে ঝকঝক করতে লাগলো। কী দিয়ে যে কী করবে আর বুঝে ওঠে না—দিদিকে অবাক করে দেবে—দিদি আশ্চর্য হয়ে ভাববে, টুলুটা

এত গুছোনো হলো কেমন করে। আর মা এদিকে আচার শুকিয়ে রেখেছেন, জামাইয়ের জন্য কতরকমের নারকোলের খাবার করেছেন—বড়ি-নাড়তে বৈয়ম ভর্তি।

আগের দিন রাত্রিটা কোনোরকমে কাটিয়ে শেষ-রাত্রেই টুলু উঠে বসে থাকলো স্টেশনে যাবার জন্যে। ভোর ছ'টায় আসবে গাড়ি,—তাগাদা দিয়ে বাবাকে পাগল করে তার অনেক আগেই গিয়ে স্টেশনে হাজির হলো তারা। প্রতিটি দণ্ড পল মুহূর্ত বয়ে যেতে লাগলো টুলুর বুকের মধ্য দিয়ে। দূরে দেখা গেলো এবার এঞ্জিনের ধোঁয়া, তারপর ধ্বক্‌ধ্বক্ ঝক্‌ঝক্ করতে-করতে গাড়ি এসে দাঁড়ালো। কম্পিত বুকে প্রত্যেকটি কামরা দেখতে লাগলো তারা। একটি সেকেণ্ড ক্লাশ কামরায় দেখা গেলো দিদির মুখ উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে প্লাটফর্মের দিকে।

'এই যে বুলু!' বাবা তাকে পেছনে ফেলে হনহন করে এগিয়ে গেলেন। টুলুর যেন পা নড়তে চাইলো না—লজ্জায় আনন্দে বিবশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে। ভিড় গোলমাল ঠেলাঠেলি—সব এড়িয়ে তারা যখন বাইরে এসে ট্যাক্সিতে উঠলো—এতক্ষণে দিদি ভালো করে তাকাতে পারলো টুলুর দিকে। একখানা হাত আস্তে টেনে বললো, 'কী রে টুলু—চুপ করে আছিস যে!' সে কিছু জবাব দেবার আগেই হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বললো, 'এই, আমার এ্যাটাচিকেসটা ঠিক আছে তো?' ভগ্নীপতি মৃদু হেসে টুলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখলে, টুলু, তোমার দিদির হুকুমটা একবার? আমি যেন ওর আর্দালি।'

'ফাজলেমি করতে হবে না—শোনো, আমার কাপড়ের স্যুটকেসটা কিন্তু চাবি ছাড়া আছে—ভিতরে দিলেই ভালো হয়।'

টুলু অবাক হয়ে দিদিকে দেখতে লাগলো। নিজের জিনিস নিয়ে

ও ব্যস্ত হতে শিখেছে। সিঁথির সিঁদুরে, মাথার ঘোমটায়, শাঁখাতে-লোহাতে মিলিয়ে একেবারে যেন অন্য মানুষ লাগলো তাকে। ভগ্নীপতি হয়তো কিছু একটা রসিকতা করতে যাচ্ছিলেন—বুলুর বাবা কুলিভাড়া মিটিয়ে এসে গাড়ির দরজায় দাঁড়ালেন—'জিনিসপত্র উঠেছে তো? তুমি দাঁড়িয়ে কেন, সুধীন, উঠে পড়ো।' লক্ষ্মী ছেলের মতো সুধীন উঠে বসলো গাড়িতে।

বাড়ি পৌঁছতেই মা ব্যাকুল-হাতে জড়িয়ে ধরলেন কন্যাকে—বুলু হাসিমুখে মাকে প্রণাম করলো

চায়ের আয়োজনে মা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, বুলু ঘুরে বেড়াতে লাগলো সারা বাড়ি। এ-ঘর ও-ঘর—প্রতিটি পরিচিত জিনিস সে নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগলো—টুলু শুকনো মুখে ঘুরে বেড়াতে লাগলো দিদির পিছনে-পেছনে। দিদির কাছে সে যে কী চায় নিজেও ঠিক বোঝে না, কিন্তু তার কাছে যেন ঠিক এই আশা করে নি। ঘুরতে-ঘুরতে আর দিদির দু'একটা কথার জবাব দিতে-দিতে হঠাৎ যেন তার মন-কেমন করতে থাকে। মনে হয় এ-যেন তার দিদি নয়—সুন্দর শাড়ি আর গয়না পরা, মাথায় সিঁদুর দেয়া, খুশিতে উপচে-পড়া এ-মেয়েটি বুঝি আর-কেউ। বারে-বারে তাকিয়ে দেখে আর কেমন একটা অভাববোধ বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। বিয়ের দু'দিন পরে ঘুরে এসে দিদির সেই ব্যাকুল আলিঙ্গনের কথা মনে পড়ে যায় তার।

একটু পরে বুলু স্নান করতে চলে গেল। যাবার মুখে বললো, 'টুলু, তুই কখন স্নান করিস রে? তোর জন্যে কী সুন্দর শাড়ি এনেছি দেখিস।'

শাড়ি দিয়ে কী করবে টুলু? শাড়ি আর দিদি নাকি সমান?

ছ'মাস আগে—বুলুর যখন বিয়ে হয়নি তখনো সে বোনকে নিয়ে স্নান করেছে—জোর করে সাবান মাখিয়ে দিয়েছে তাকে—ফ্রক কেচে দিয়েছে—মাথা আঁচড়ে ফিতে বেঁধে দিয়েছে—জুতোর স্ট্র্যাপ বেঁধে দিয়েছে—ছোট্টো থেকে দিদির হাতেই এ-সব করতে অভ্যস্ত সে। আর দিদি যখন চলে গেলো কত যে তার কষ্ট হয়েছে এ-সব করতে—কত যে, চোখ ভরে-ভরে জল এসেছে দিদিকে মনে করে সে-কথা কে জানে? বাথরুমে গিয়ে বুলু দরজা বন্ধ করে দিতেই তার ছোটো বুক অভিমানে ভরে গেলো। প্রাণপণ শক্তিতে কান্নাকে ঢোঁক গিলে সে মায়ের কাছে—পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললো, 'আমি ইস্কুলে যাবো, ভাত দাও।'

ছোটো মেয়ের দিকে নজর দেবার সময় আজ নয়। আচমকা ধাক্কা খেয়ে মা চটে উঠলেন, 'সর বলছি দুষ্টু মেয়ে, লোকজন দেখলে যেন বাড়ে!'

একটু না-সরে অভিমান-রুদ্ধ গলায় টুলু বললো, 'না, আমাকে ভাত দাও, আমি ইস্কুল যাবো।'

'কেন, আজ ইস্কুল যাবার হলো কী! দিদি-দিদি করে তো পাগল—এখন আবার ঢং করা হচ্ছে।'

'না, তুমি ভাত দাও।'

'বিরক্ত করিস না, টুলু—'মা মেয়ে-জামাইয়ের আহার্য প্রস্তুতে মন দিলেন।

'ভাত দাও!'

গলা থেকে হাত ছাড়িয়ে নিতে-নিতে মা রেগে উঠে বললেন, 'টুলু, সর বলছি—'

'আমি স্কুল যাবো, ভাত দাও।'

'না, তুমি ভাত পাবে না—' মা এবার সজোরে ঠেলে দিলেন তাকে। এই সামান্য আঘাতেই টুলু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো ছেলে-মানুষের মতো।

মুখ ফিরিয়ে মা বললেন, 'একটা থাপ্পড় লাগিয়ে দেব, টুলু। বুড়ো-ধাড়ি মেয়ে, লজ্জা নেই—ভগ্নীপতি আছে ও-ঘরে, আর ও এখানে কাঁদতে লেগেছে।'

তবু টুলু নির্লজ্জের মতো কাঁদতে লাগলো।

দু'হাঁটুতে মুখ ঢেকে—একটা অনির্দিষ্ট দুঃখের আবেগে বুক ভেঙে গেল তার। সে-দুঃখ কত গভীর, কত মর্মান্তিক মা তার কিছুই জানলেন না,—কেউ জানবে না কোনোদিন আর টুলুই কি জানে সে-কথা? তার কেবল মনে হতে লাগলো দিদি যদি আর কোনোদিন না আসতো তবেই ভালো হতো—দিদি কেন এলো? আর যদিই বা এলো, তবে তার সেই দিদি কেন ফিরে এলো না?

পটলি

পটলি যে ভয়ানক দুষ্টু, ভয়ানক মন্দ, এ-কথা শেয়ালদার ইষ্টিশন-পাড়ায় কে না জানে? ব্যারাকের বাবুরা, গিন্নীরা, ছেলে-মেয়েরা, কুলি-কাবারি কেরানী যাকেই জিজ্ঞেস করো না কেন, একডাকে তারা বলে দেবে কোন মেয়েটার নাম পটলি আর স্বভাবটিই বা তার কেমন। পটলি নিজেও জানে সে-কথা। মাঝে-মাঝে যখন ভীষণ মার খায় তার বাবার কাছে তখন যে মনটা একটু উদাস-উদাস না হয় তা নয়, কিন্তু আজে-বাজে ভেবে বেশিক্ষণ নষ্ট করবার তার সময় কই বলো দেখি? ততক্ষণে পাড়ার সবচেয়ে বখা ছেলে নন্দার সঙ্গে দু-দান তক্কু খেললে কাজ দেবে।

মার মুখের বকুনি তো জলভাত, এদিকে কাকারা, পিসিরা, দুই দিদি—তারাও সব হয়রান হয়ে গেলো শোধরাবার চেষ্টায়। অসম্ভব! আট বছরের মেয়ে, সমস্তটি দিন সে রাস্তায়। নোংরা ফ্রক, ছাঁটা চুল এখন পর্যন্ত হাজার চেষ্টা করেও তার মাথায় চুল রাখা গেল না। ছাঁটিয়ে না দাও, নিজেই কাঁচি চালিয়ে এবড়ো খেবড়ো করে মাথা মুড়িয়ে নেবে। বলে, 'আমার গরম লাগে, অসুবিধে হয়।' মা রেগে তেড়ে যান, 'তুই মেয়ে না? ধেড়ে গোপাল হয়ে দিন-দিন কী বাহারই খুলছে তা কি দেখেছিস কোনোদিন আয়না দিয়ে?' চড়টা-চাপড়টা বকুনিটা প্রায় সকলেই চাঁদা করে চালাচ্ছে, কিন্তু বেঁধে রাখলেও দাঁত দিয়ে দড়ি কেটে বেরুবে সে।

পটলির ঘুম ভাঙে ভোর চারটেতে। ফ্ল্যাটের দরজা খুলে টিপি-টিপি পায়ে সে তক্ষুনি বেরোয়। যতক্ষণ না রাস্তায় এসে দাঁড়ায় ততক্ষণ তার যেন দম বন্ধ হয়ে থাকে। ঘুরে-ঘুরে ঐ ইট-পাথরের পাড়া থেকে কেমন করে যে চমৎকার-চমৎকার সব ফুল সংগ্রহ করেতা

সে নিজেই কেবল জানে। সেইসঙ্গে মুলোটা, ডাঁটাটা, দুটো ঢ্যাঁড়স কিংবা পুঁইলতাও যে না আনে তাও নয়। তার বাবা ইস্টিশনের

কনট্রোলার, পুরোনো লোক, মানুষ অত্যন্ত ভালো। সবাই তাঁকে ভালবাসে, সবাই চেনে, সম্মান করে--কিন্তু এই মেয়ে নিয়ে লজ্জায় তিনি লোকের কাছে আর মাথা তুলতে পারেন না। সে দিন বড়ো-সাহেবের মালি যখন তাকে হাতে-নাতে ধরে নিয়ে এলো তাঁর সামনে, তখন তাঁর মনে হলো, ধরণী, দ্বিধা হও। ফুল চুরি করলে না-হয় কথা ছিলো, কিন্তু সাহেবের অত যত্নের একসার বাঁধাকপি উপড়ে এনেছে সে, একটি টোম্যাটোও রেখে আসেনি গাছে, তারপর বেগুন ছিঁড়তে গিয়ে ধরা পড়েছে। সাহেবের এই বাগানটির পেছনে মাসে প্রায় তিনশো টাকা খরচ। সে জানলে কি আর উপায় আছে? মালির হাতে একখানা দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে কাঁদো-কাঁদো গলায় নামটি একেবারে চেপে দিতে অনুরোধ করলেন প্রসন্নবাবু। তারপর ঘরের মধ্যে হিঁচড়ে টেনে এনে মারতে-মারতে রক্ত বার করে দিলেন মেয়ের। কিন্তু পটলি স্থির। কিছুতেই তিনি মেয়ের মুখ দিয়ে এই কথাটি বলাতে পারলেন না যে, সে আর এ-রকম করবে না। ক্লান্ত হয়ে শেষে নিজেই থামলেন, এমন কি, একবেলা আপিসও কামাই হলো সেদিন।

সকালটা নেহাতই শরীরের ব্যথায় একেবারে মরার মতো পড়ে রইল পটলি, তারপর খেয়ে-দেয়ে দুপুরেই সে হওয়া। ফিরলো একেবারে সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে। সে-সময়টায় প্রসন্নবাবু আপিসে থাকেন, মেয়েরা কাজকর্ম সেরে ছাতে বেড়ায়। ফাঁক-তাক বুঝে চুপি-চুপি এসে, যে-ছোট্ট কুঠুরিতে ট্রাঙ্ক বাক্স থাকে, কাপড়ের আলনা আর জুতোর র‍্যাক থাকে, সেই ঘরে টাল-করা ছেঁড়া-খোঁড়া বাড়তি বিছানা-বালিসের পেছনে গুটিসুটি শুয়ে পড়লো নিঃশব্দে। শোয়ামাত্র ঘুম। খাটুনি তো বড়ো কম যায় না সারাদিন।

খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ। রাত দশটা অব্দি তার পাত্তা না পেয়ে বাড়িসুদ্ধু সব ভেবে আকুল। শেষে খবর গেল আপিস-ঘরে। প্রসন্নবাবু তৎক্ষণাৎ কাজকর্ম ফেলে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। কী জানি যা মার মেরেছেন সকালবেলা, মনের দুঃখে ট্রেনের তলায় কাটা পড়লো নাকি? পিসির ফিশির-ফিশির লাগালো, দুই দিদি চোখ টান করে বাবাকে দোষ দিতে লাগলো, আর মা গালে হাত রেখে জানলায় চোখ পেতে চুপ। বুকের মধ্যে কেমন করছে তাঁর। প্রসন্নবাবু সারাদিনের ক্লান্ত শরীর নিয়ে স্টেশন-পাড়াটুকু চষে ফেললেন। লণ্ঠন নিয়ে রেল-লাইনগুলো সব দেখলেন। তাদের ব্যারাকে সাড়ে-তিনখানা কুঠুরি নিয়ে চল্লিশঘর রেলওয়ে কর্মচারীর বাস। পাঁচতলা বাড়ি। সব ক'টা তলা সকলে মিলে ঠ্যাং ভেঙে-ভেঙে খুঁজলো। কোথায় সে? এগারোটায় যখন পুলিশে খবর দিতে বেরুচ্ছেন, তখন কাতি-ঝি চেঁচিয়ে উঠলো—'ও মা, দেখ'সে তোমার মেয়ের কাণ্ড! ততক্ষণে জেগে বসে বেশ করে মজা দেখছে পটলি। কে জানবে বলো যে এই একটি বাক্সের মতো ঘরে, ঐ আবর্জনার স্তূপে, এই অসহ্য গরমে আর মশার কামড়ে এমন নিশ্চিন্ত বসে থাকতে পারে একটা মানুষ! বকবে কী, তার ছোট-ছোট সাদা দাঁত বার-করা একগাল হাসিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে সব হতভম্ব।

প্রসন্নবাবুর বলতে গেলে সারাদিনই আপিস। কাছাকাছি বাড়ি, দরকার-মতো আসেন। যেমন—সকালে চা খেয়ে বেরিয়ে যান আবার বারোটায় খেতে আসেন, খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে চলে যান, আবার পাঁচটায় এসে চা খেয়ে যান। আর এই যে যান, আর আসেন রাত বারোটায়। বাবার গতিবিধির সঙ্গে পটলির গতিবিধি রুটিন করা। কারণ, একমাত্র বাবাকেই সে ভয় করে। অন্য কোনো কারণে না,

বাবার শরীরে তার চাইতে ঢের বেশি জোর বলে তিনি যখন মারেন তখন কিছুতেই সে হাত ফসকে পালাতে পারে না। দু'দিন অবিশ্যি পুলিশ-পুলিশ বলে চেঁচিয়েছিলো, কিন্তু তাতে বাবা আরো মারলেন। তাই ক'দিন থেকে ভাবছিলো, পাড়ার বয়েজ এ্যাসোসিয়েশনের কুস্তির আখড়ায় ভরতি হবে। পুলিশ ডেকে বাবাকে ধরিয়ে দেয়া কিম্বা কুস্তির প্যাঁচ শিখে হাত ফসকে পালিয়ে যাওয়া, এ দুটো বুদ্ধিই অবিশ্যি নন্দাই তাকে দিয়েছিলো। মা বলো, বাপ বলো—এই পৃথিবীতে নন্দার মত বন্ধু তার আর কে আছে? কিন্তু মুশকিল হলো এই যে সেখানে ভরতি হতে আবার চাঁদা লাগে। বাবা আপিসে যাবার পরে, একপেট খেয়ে জানলার ধারে বসে-বসে এসব কথাই সে ভাবতে লাগলো। তারপর হঠাৎ মাদুর বিছিয়ে তিনখানা ছেঁড়া বই নিয়ে সটান মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে হাঁটু থেকে নিচের ঠ্যাং দুটো আকাশের দিকে তুলে নাচাতে-নাচাতে প্রচণ্ড জোরে পড়তে শুরু করে দিলো। মা ছুটে এলেন রান্নাবান্না ফেলে, পিসিরা এলো, দিদি দুজন হেসে হেসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়লো, 'আরে আমাদের পটলি দেখছি একদিনেই মানুষ হয়ে গেল, এঁ্যা? মারের চোটে তাহলে সত্যি ভূত পালায়? এসব টিপ্পনি শুনলেই মাথায় রক্ত চড়ে পটলির, তৎক্ষণাৎ জেদ বেড়ে যায়, সেই সব অপকর্ম করার জন্য। আজ একবার কটমট করে তাকিয়েই নিজেকে সামনে নিলো।

দুপুরে বাবা এসে সব শুনে দারুণ খুশি। কচি শরীরের এখানে-ওখানে কালকের মারের কালসিটের দিকে তাকিয়ে পুরো একটা টাকাই তিনি দিয়ে ফেললেন চকোলেট খাবার জন্য। ব্যস্! বাবা বেরুবার সঙ্গে-সঙ্গেই আর পটলিকে পায় কে? বেরিয়ে প্রথমেই সে গলির মোড়ে। তাদের বাকি কাপড়-চোপড়ের দোকানে গিয়ে একটা

হাফ-প্যাণ্ট আর হাফ-শার্ট কিনলো (এটাও নন্দার বুদ্ধি। মেয়ে দেখে যদি কুস্তিতে না নেয় তাই ছেলে সেজে যাওয়াই ভালো), গাছতলায় নাপিতের কাছে বসে ঘাড় চেঁছে ছ'আনার বাটি-ছাঁট দিলো, তারপর দু'আনার ফুলুরি কিনে খেতে খেতে আমিরি চালে বসলো এসে ইষ্টিশনের কুলিদের আড্ডায়। তারা তখন দু'টার গাড়ি পাস করিয়ে গান গাইতে-গাইতে বড়ো-বড়ো কানি-উঁচু কাঁসারিতে লঙ্কা দিয়ে ছাতু মাখছে। পটলিকে দেখে খুশি হয়ে উঠলো—'হারে, হামাদের পটলি মায়ি যে, আও আও। সারা সকাল তুমি কোথায় ছিলে।' পটলি মাথা নেড়ে মুচকি-হাসলো, তারপর হাতের মুঠোয় ঘামভরা পয়সা-গুলো টুনটুন আওয়াজ করতে করতে একডালা ছাতু তুলে মুখে দিয়ে বললো, 'সকালমে হাম আর নাই আয়েগা, রঘুয়া।'

'কাঁহে ?'

'হাম কুস্তি লড়েগা, সকাল-বিকাল দো-টাইম মে।'

'বা, বা, ইতো বহুৎ আচ্ছি বাৎ হ্যায় !'

'আজ হাম চার বাজে আখড়ামে চল যায়েগা। এই দেখো, চাঁদা ভি হ্যায় হামারা পাস।'

বুড়ো কুলির চোখ গোল-গোল হলো। 'তবতো বহুৎ বড়হা আদমি হো যাতা তোম, এঁ্যা ! খাও,-খাও, ফুর্তিসে আউর থোড়া ছাতু খাও।' ঘাড়ছাঁটা পটলি ফুর্তিসেই ছাতু খেতে লাগলো। এই সময়ে সে রোজই এদের সঙ্গে খায়। এটা তার লাঞ্চটাইম।

তারপর এলো তিনটের গাড়ি। হুঁড়োহুড়ি করে কুলিরা মাল নামাতে চলে গেলো, একটা লোহার বেঞ্চির উপর পা ঝুলিয়ে বসে-বসে দেখতে লাগলো পটলি। স্রোতের মতো মানুষ—মাথায়-মাথায় কালো—চুপ চাপ জায়গাটা হঠাৎ যেন একটা ভোজবাজির মতো

মুহূর্তে গমগম করে উঠলো। পানবিড়ির চীৎকার, গরম চায়ের হাঁক, আপেল-বেদানার ঠেলাগাড়ি, হুইলারের দোকানে ভিড়, ইঞ্জিনের ধোঁয়া, শান্টিংয়ের আওয়াজ, তীক্ষ্ণ হুইসিল—সব মিলিয়ে একটি যেন রূপকথার রাজত্ব। কোন জাদুকর ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলো? সোনার কাঠি ছুঁইয়ে ঘুম ভাঙালো কে? একটু পরেই আবার সব চুপ।

সেদিন কী জানি কেন, বড়ো কুলি হতে সাধ গেলো পটলির। কুলিদের মতো সুখী ত্রিভুবনে আর কাউকেই মনে হলো না তার। তাদের কেমন মা নেই, বাবা নেই, কেমন তারা ইচ্ছে মতো খায়-দায় ঘুমোয়, কতো রোজগার করে—না, আখড়ায় সে আর যাবে না, কাল থেকে নিশ্চয় সে কুলি হবে। তৎক্ষণাৎ বাকিতে কেনা শার্ট প্যান্ট রেল-লাইনে ছুঁড়ে ফেলে দিলো!

প্রসন্নবাবুর আপিসেই কাজ সবসময়। স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে বছরে একদিনও আসেন কিনা সন্দেহ। দিনচারেক পরে বিশেষ কোনো-একটা উপলক্ষ্যে একজন বন্ধুর সঙ্গে তিনি প্ল্যাটফর্মে এলেন সিরাজগঞ্জ প্যাসেঞ্জার এসে সবে থেমেছে। খুব ভিড়, পা ফেলার জায়গা নেই। আস্তে এগুতে-এগুতে হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন। পায়ের পাতা পর্যন্ত ঝলঝলে মস্ত রেলওয়ে কোট গায়ে দিয়ে ছোট্ট পটলি ছুটে-ছুটে মাল নামাচ্ছে গাড়ি থেকে। প্রথমটায় তিনি বুঝতে পারেননি, কিন্তু ধরনটা যেন কেমন চেনা-চেনা। লক্ষ্য করে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কে যেন মাটির সঙ্গে আটকে দিল তাঁর পা! আর এগুতে পারলেন না, সোজা ফিরে এলেন আপিসে। সেখানে এসে ঝিম ধরে বসে রইলের খানিক, তারপর আরেকজনের উপর ডিউটি ছেড়ে ছটফটিয়ে বাড়ি চলে এলেন। পটলি একটু পরেই বাড়ি এলো। সেদিন বাড়িতে মাংস রান্না হচ্ছিলো। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই

তার গন্ধে পটলির মন খুশিতে ভরপুর হয়ে উঠলো। পেটের নাড়িভুঁড়ি মোচড় দিয়ে উঠলো খিদেয়। দরজা ঠেলে ঢুকতে ঢুকতে ছোড়দিকে সামনে পেয়ে একগাল হেসে বললো, 'হ্যাঁরে ছোড়দি, পোসোন্নবাবুর দেখছি আজকাল বেশ টাকাকড়ি হয়েছে, কেমন মাংস-টাংস আসছে বাড়িতে!' বলতে বলতেই থেমে গেল—ছোড়দি কই! এ যে বাবা! যেন বাঘ আর হরিণ। দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণের জন্যে একেবারে চুপ। তারপরে মুহূর্তে কিসে থেকে যে কী হলো—বাবা একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার উপর। অত বড়ো হাতের পাতার একটা চড়েই উল্টে সে মাটিতে পড়লো, তারপর আরেকটা, আরেকটা, আরেকটা—একটা দাঁত ভেঙে গাল থেকে রক্ত ছুটলো। হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এলেন মা, মেয়েকে একেবারে বুকের তলায় আড়াল করে দাঁড়ালেন। কিন্তু প্রসন্নবাবু যেন উন্মাদ হয়ে গেছেন···কাকে মারছেন, কী করছেন কিছুই যেন জ্ঞান নেই তাঁর। কেটে ফেললেও মেয়ের মুখ দিয়ে আজ পর্যন্ত একটি টুঁ শব্দ বেরোয়নি, সে হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো, 'বাবা, মাকে মেরো না, মাকে মেরো না—এই যে আমি, এই যে আমি' মার বুকের তলা থেকে প্রাণপণে ছিটকে বেরিয়ে এলো সে— 'মারো, মারো, মেরে ফেল আমাকে। মাকে না, আমার মাকে না!' অ্যাঁ! এ তিনি কাকে মারছিলেন? স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে প্রসন্নবাবু অবাক হয়ে গেলেন। তারপর মাথা নিচু করে আস্তে ঘরে চলে গেলেন।

তারপর একদিন, দুদিন, তিনদিন কেটে গেল; বাড়ির আর-আর সব যেমন তেমনই চলতে লাগলো, কিন্তু পটলির মা যেন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। সব সময়েই তিনি চুপ, সব সময়েই গম্ভীর। তবু আর সকলের সঙ্গে যেমন-তেমন, পটলির সঙ্গে একটি কথা তিনি

বললেন না এ কয়দিনের মধ্যে। রাত্রে এক বিছানায় শুয়েও যেন কত দূরের মানুষ তিনি! ভুল করেও তো মানুষ একবার গায়ে হাত দেয়? একবার কাছে টানে? পটলি ইচ্ছে করে পা ছোঁড়ো, খালি মাথায় শুয়ে থাকে, বিছানা থেকে গড়িয়ে মাটিতে চলে যায়, মা তাকিয়েও দেখেন না। যেন পটলি তাঁর কেউ নয়, পটলি বলে কেউ কোনোদিন ছিল না তাঁর। চার দিনের দিন আর পারলো না সে; মার বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

মা বললেন, 'কাঁদিস কেন?'

'তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো না কেন?'

'আমার কথা কি তুই শুনিস?'

'শুনবো।'

'শুনবি?'

'হ্যাঁ মা, শুনবো। সব শুনবো।'

'তবে শোন, আর আমাকে কষ্ট দিস না, লজ্জা দিস না, তোর বাবার মাথা হেঁট করে দিস না লোকের কাছে।'

'তা-ই হবে মা, তাই হবে।'

'তা-ই হবে?

'তা-ই হবে।'

মা মেয়েকে বুকে জড়িয়ে চুমু খেলেন।

এর পরে তোমাদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগবে, পটলি কি সত্যিই তার কথা রেখেছিল? সত্যিই কি ভালো হয়েছিল? আমি তখন তোমাদের উল্টো প্রশ্ন করবো—তোমরা হলে কি করতে?

প্রতিবেশী

রাত্তিরে শুতে এসে বাবা-সাপ বললেন, 'ছাখো, একটা কোলা-ব্যাং খেতে গিয়ে অনেকক্ষণ সেটা গলায় আটকে ছিল। সেই থেকে গলাটাও ব্যথা, শরীরটাও খারাপ লাগছে। কিন্তু আজকে এ-বাড়িতে হলো কি? এমন হুড়দাড় করছে কারা? এত কি কখনো ঘুম হয়?'

মা-সাপ বিঁড়ে পাকিয়ে বাচ্চাদের সব ক'টাকে বুকের তলায় ঘুম পাড়াচ্ছিলেন—ফিসফিসিয়ে বল্লেন,' বাড়িতে যে আজ অনেক লোকজন এলো দেখলুম।'

ছোটো ছেলেটা লেজ তিরতির করে নাড়া দিয়ে বললো, 'হ্যাঁ বাবা, ছোটো ছোটো মানুষও আছে ওদের মধ্যে। একটা যে কী সুন্দর মেয়ে আছে—সে বোধহয় আমার সমান।'

চিন্তিত মুখে তার বাবা জবাব দিলেন, 'মানুষগুলো শুনেছি লোক ভালো না—বাবা বলতেন, ও-জাতকে বিশ্বাস করতে নেই! কী জানি আবার আমাদের উপর না ওদের সুদৃষ্টি পড়ে!'

মার একটু তন্দ্রা এসেছিল বোধ হয়, বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোমার আবার সবেতেই একটু বেশি বেশি চিন্তা আছে। কেন, মানুষরা মন্দ লোক কী? আমার তো বেশ লাগে। ঐ তো সেবার এক গিন্নী এসে-ছিলেন এখানে—এই সিন্দুকটার উপর তাঁর নাতিকে নিয়ে রোজবসতেন এসে রোদ পোয়াতে, কোনোদিন তো কিচ্ছু বলেননি আমাকে। এই বারান্দার কোণে তো কতকাল থেকে এটা পড়ে আছে, আমরাও

আছি। এই তো পাশের ঘরেই সেবার গিন্নীর ছোটো ছেলে শুতো, কতদিন বর্ষার রাত্তিরে আমি ঘরে গিয়েছি, শুয়ে থেকেছি খাটের তলায় ট্রাঙ্কটার পেছনে—কিছু বলেনি তো!'

সাপিনীর বড়ো ছেলে—সবে সে বেশ বড়ো-সড়ো হয়ে উঠেছে;

তার কালো আর সাদা চামড়ায় উজ্জ্বল রং ধরেছে, আর মাথার ফণা চাটালো হয়েছে অন্তত তিন আঙুল। সে অনেক খবর রাখে। মার

কথায় হেসে বললো, 'মা তুমি নিতান্তই ভালোমানুষ ! তুমি ভাবতেই পারো না মনুষ্যজাতটা কী অসাধারণ খারাপ ! তুমি কি ভেবেছ তোমাকে দেখতে পেয়েও ওরা কিছু করেনি ? আসলে অত রাত্রিতে যখন তুমি ঢুকতে আর ভোরবেলা যখন তুমি বেরুতে, কোনো সময়েই ওরা জেগে থাকতো না। দেখছো না কেমন লড়াই লেগেছে ওদের মধ্যে ! ভারি স্বার্থপর জাত ওরা। আর এত নিষ্ঠুর যে কাউকে আঘাত করতেই ওরা দ্বিধা করে না, তা তুমি কিছু করো আর নাই করো।'

বড়ো মেয়ে এতক্ষণ চুপ করেই ছিলো, এবার বললো, 'দাদা যা বলেছে, ঠিক বলেছে মা ! ভারি লোভী জাত এরা। আমার সই হাস্নুহানা তো দুচারবার শহরেও গেছে। সে বলে যে ওরা অকারণে একজন আর একজনকে মারে। ও স্বচক্ষে দেখেছে যে একজন কেবল বসে বসেই এতগুলো খায়, আর একজন রাতদিন ভুতুড়ে খাটুনি খেটেও পেট ভরে খেতে পায় না। হ্যাঁ মা, আমাদের মধ্যে তো তা নেই—আমরা ঝোপেঝাড়ে, বনে-বাদাড়ে যে যতটা পারি খেয়ে আসি কেউ বাধা দেয় না।'

মা ভালো করে বিঁড়ে পাকাতে পাকাতে বললো, 'তা বাপু তোমরা যাই বলো—ওদের উপর আমার দস্তুরমতো মায়া হয়। ঐ তো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শরীর কিন্তু আছে আমাদের মতো বিষ ? কেমন করে যে সংসারে ওরা বেঁচে আছে, আশ্চর্য ! এই তো দেখ বাড়ি-ঘর তো এখন গিসগিস করছে লোকে—আমরা সবাই মিলে যদি যাই ঘরে আর গায়ে বিষ ঢেলে আসি, তাহলে কি হবে ওদের দশা তা ভেবেছিস ? ঘুমুচ্ছে তো এখন সব—কিচ্ছু জানতেও পারবে না আমরা ঢুকলে।'

ছেলে বললো, 'তা হলে চলো—একজনকে অন্তত—'

অমনি বাধা দিয়ে বাবা বল্লেন, 'ছি ছি ছি! এমন নীচ মন তোমার? তোমাকে যতক্ষণ না আঘাত করবে, কেন তুমি তার আগেই নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করবে? পরমপিতা মহানাগ ক্ষমতা দিয়েছেন আত্মরক্ষার জন্য—ধ্বংস করবার জন্য নয়।'

মা বললেন, 'এত লোক কিন্তু আর কখনো দেখিনি, আছি ত কম দিন না—এই সিন্দুক হল আমার শ্বশুরের আমলের!'

'এরা যে সব ঈভ্যাকুঈ মা, বোমার ভয়ে পলাতক!'

বাপ-মা ছেলের বিদ্যে দেখে হাঁ হয়ে গেলেন—বুঝলেন না কিচ্ছু। মা কেবল বল্লেন, 'যাকগে, রাত অনেক হলো, এবার ঘুমুই কিন্তু বাবা দেখিস রাগের মাথায় আবার কাউকে কামড়ে-টামড়ে দিস না। ওরাও আছে, আমরাও থাকি—ঝগড়াঝাঁটির দরকারটা কি?'

তখনকার মতো সাপ-পরিবার নিশ্চিন্ত মনে ঘুম দিল। শেষ-রাত্তিরে বাবা-সাপ আর বড়ো-বড়ো ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে গেলো খাবারের সন্ধানে—ছোটো তিনটি বাচ্চা ও গোটাকয়েক আফোটা ডিম বুকের তলায় করে মা রইলো ঘর আগলে। ভাবতে লাগলো কবে ফুটবে এই ডিম ক'টা আর কবে ওরা আর একটু চলতে ফিরতে পারবে নিজের হাতে পায়ে! গভীর মমতায় সাপিনী নিজের জিভ বুলিয়ে দিল বাচ্চা কটার গায়ে। এরা ভারি মা-ন্যাওটা!

সাপিনী ভাবলো, 'আরো তো কত বাচ্চা আছে ওদের বন্ধুদের মধ্যে, তারা তো বেশ মা ছেড়ে খেলা-টেলা করে বেড়ায়—এরাই কেবল মা-মা করে! আর এমন করলে এদের ছেড়ে থাকা যায়?'

ভাবতে ভাবতে সাপিনী মাথা গুঁজলো বাচ্চাদের মধ্যে।

রাত্রে কী জানি কেন, ভালো করে সে ঘুমুতে পারেনি। মনটা যেন কেমন করেছে! মাথা গুঁজতে-না-গুঁজতেই সে ঘুমিয়ে পড়লো।

সকাল বেলা হঠাৎ একটা শব্দে সে চমকে দেখলো—বাক্সের ডালাটি একটু ফাঁক করেই একটা দুশমন চেহারার লোক দৌড়ে পালিয়ে গেলো—সঙ্গে সঙ্গে কলরব করতে করতে আরো একদল লোক দৌড়ে এলো লাঠি-সোটা নিয়ে।

সাপিনীর বুকের মধ্যে ধ্বক-ধ্বক করতে লাগলো। তাড়াতাড়ি জাপটে সবাইকে বুকের তলায় টেনে নিয়ে, মাথা তুলে দাঁড়ালো সে। প্রায় দশ আঙুল চওড়া ফণা তুলে এপাশে দুলতে লাগলো বাক্সের মধ্যে।

সিন্দুকটার একটা কোণ নিচের দিকে ভাঙা, কিন্তু এতগুলো সন্তান ফেলে সে পালাবে কেমন করে? অস্ফুটে সে বললো, 'ওগো মানুষ, মেরো না আমাদের। আমরা তোমাদের কতকালের প্রতিবেশী—কোনো তো ক্ষতি করিনি কখনো! তোমাদের পায়ে পড়ি, মেরো না—ওগো মেরো না।'

দূর থেকে একটা লাঠি দিয়ে একটা লোক আবার তুলে ধরলো বাক্সের ডালাটা, সঙ্গে সঙ্গে ঠাস কড়ে একটা বাড়ি পড়লো সাপিনীর মাথায়।

অব্যক্ত যন্ত্রণায় মাথাটা সে দুবার ঝাড়া দিয়ে বাক্সের গায়েই ছোবল মারতে লাগলো। আর বাচ্চাগুলো ভয়ে মার বুকের মধ্যে আরো জোরে আঁকড়ে রইল।

শব্দ উঠলো, 'মার! মার! তেজ কত ছাখ না—ঈস্, কি চাটালো ফণা!'

সাপিনী তার পাথরের মতো আশ্চর্য সুন্দর চোখ মেলে তাকালো মানুষের দিকে—তার বোবা ভাষায় সে বললো, 'আমাকে মারা আজ অতি সহজ। হে মানুষ, তোমরা ভাবছো এটা খুব বীরত্ব হলো, কিন্তু

তোমরা জানো না আজ আমি মাতৃত্বের দায়ে বন্দী ! সন্তানের মমতায় আবদ্ধ আছি, নইলে কখন বেরিয়ে আসতাম ঐ সুড়ঙ্গ-পথে, সর্বনাশ করতে পারতাম তোমাদের। একবার যদি আমি বাইরে এসে দাঁড়াতাম, সাধ্য ছিলো আমাকে তোমরা মারতে পারো ? কিন্তু—'

ঠাস ! ঠাস !—

প্রকাণ্ড লম্বা এক ভারি লাঠির আঘাতে নুয়ে পড়লো সাপিনীর মাথা। জানি না তার কণ্ঠে শব্দ থাকলে কত বড় আর্তনাদ আজ বেরুতো সেখান থেকে। কেবল দেখা গেলো, তার মুখের দুপাশে একটু-একটু রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। অসহ্য যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর মুচড়ে-দুমড়ে সে একাকার করে ফেললে—তারি মধ্যে নিচু হয়ে সে শেষ চুম্বন করলো তার প্রাণতুল্য সন্তানদের।

টেনে তোলা হলো তার পাঁচ হাত লম্বা মসৃণ সিল্কের মতো অপূর্ব সুন্দর শরীর—কিলকিল করে উঠলো বাচ্চাগুলো—'মা গেলো কোথায় ?'

একটু বড়ো বাচ্চাটা আকুল হয়ে ছোট্ট মাথাটি তুলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলো। কিন্তু তাদের আয়ুও মানুষের হাতে শেষ হয়ে গেলো কয়েক মুহূর্তের মধ্যে।

অনেক রাত্রে বড়ো ছেলেমেয়েরা আর বাবা-সাপ ফিরে এসে আর দেখতে পেলো না তাদের নির্দিষ্ট বাসস্থান। ছেলেমেয়েরা গুমরে উঠলো 'মা, মা' বলে। যুবক ছেলেটি কাঁদতে-কাঁদতে বললো, 'নিষ্ঠুর মানুষগুলো নিশ্চয়ই আমার মাকে আর ভাইবোনদের মেরে ফেলেছে !'

কেঁদে-কেঁদে তারা অবশেষে উঠোনের এক কোণে দেখতে পেলো তাদের সেই সিন্দুকটা ভাঙা-ভাঙা হয়ে পড়ে আছে উপুড় হয়ে।

এবার বাবা-সাপটাও কেঁদে উঠলো দুঃসহ কষ্টে। তারপর সংযত

হয়ে লেজে ভর করে সে সমস্ত শরীরটা প্রায় মাটি থেকে তুলে ফেললে—চোখ-মুখ জ্বলে উঠলো প্রতিহিংসার জ্বালায়। গম্ভীর স্বরে বললো, 'বাবা, তোমরা সব দেখলে তো মানুষের শঠতা, নিষ্ঠুরতা! কতকাল ধরে প্রতিবেশী হয়ে বাস করছি এখানে—মুখের কাছে বসে কত শিশুকে দেখেছি খেলা করতে, কত বড়োরা এসে বসেছে এখানে—তোমার মা ভুলেও সেদিকে তাকাননি—এক-আধ সময় তোমরা একটু তিড়িং-বিড়িং করেছ—আর অমনি তোমার মা তোমাদের শাসন করেছেন। দেখলে তো তার ফল? তোমরা যাও—কিন্তু আমি নড়বো না এ-বাড়ি থেকে। দেখি আমিও কাঁদাতে পারি কিনা।'

এই বলে সাপটা প্রবলবেগে ফণা আছড়াতে লাগলো মাটিতে!

সাতদিন ধরে ক্রমাগত চেষ্টা করে-করেও সাপটা একটা সাবালক মানুষকে বাগে পেল না। ছোটোদের দুদিন পেয়েছিল একেবারে মুখের কাছে, কিন্তু তারা যে ছোটো! তারা কী জানে? সাপটার নিজেরও তো ছেলেমেয়ে আছে? কিছুতেই বিষ ঢালতে পারেনি তাদের শরীরে।

কদিন পরে কাল রাত্রিতে বৃষ্টি হয়েছিলো—আজকের আকাশ ভারি সুন্দর। বাঁধানো পুকুরের ধারে এসে থামলো সাপটা—আঃ, কী মিষ্টি গন্ধ আসছে! নিশ্চয়ই কেয়া ফুটেছে আজ! টলমল করছে পুকুরের জল—সাপের মনটা কেমন স্নিগ্ধ আরামে ভরে উঠলো। কদিনে তার শোকটাও একটু উপশমিত হয়ে এসেছিলো। কেয়ার ঝোপে এসে বসলো সে।

ফুলের গন্ধে মন-প্রাণ তার আকুল হয়ে গেলো—মনে মনে ভাবলো—'ঈশ্বর কত আনন্দ দিয়েছেন পৃথিবীতে—কেন আমরা দুঃখ পাই কদিনেরই বা জীবন? না, কোনো গ্লানি মনে রাখবো না—কোন প্রতিশোধ চাই না আমি—যারা গেছে তারা যাক—তারা শান্তি

পাক—ক'দিন পরে তো আমিও যাবো সেখানে।'

এর মধ্যেই কেয়া-ঝোপের একটু দূরে দুখানি পা এসে থামলো। শক্ত সমর্থ পা। সাপের চোখটা একটু চিকচিক করে উঠেই থেমে গেলো—নাঃ! আজ আর কাউকে হিংসা করবে না।

স্তব্ধ হয়ে সে তাকিয়ে রইলো সেদিকে।

মানুষটি এসে বসলো ঘাটের সিঁড়িতে—তারই দিকে পেছন ফিরে। তারপর পকেট থেকে বার করলো একটা বাঁশের বাঁশি, আর তাতে সুর দিতেই আকুল হয়ে উঠলো সাপ।

এক মিনিট, দুমিনিট দশ, পনেরো আধঘণ্টা ধরে বেজে চললো বাঁশি উন্মনা হয়ে ঝোপ থেকে সে বেরিয়ে এলো। তার খেয়াল রইলো না এটা রাত্রি নয়, দিন, এটা স্বর্গ নয়, পৃথিবী। এখানে চলে হানাহানি, হিংসার দ্বন্দ্ব।

সমস্ত ভুলে গেলো সে বাঁশি শুনে—কিন্তু কতক্ষণ সে অমন তন্ময় ছিলো সে-সময়ের হিসেব তার মনে নেই। হঠাৎ একটা অসহ্য আঘাতে ভেঙে গেলো তার কোমর—স্বপ্নের স্বর্গ থেকে এবার আর্তনাদ করে নেমে এলো সে শত্রু-সংকুল পৃথিবীর মাটিতে। রাগে, দুঃখে, ব্যথায় জর্জরিত হয়ে চেষ্টা করলো সে দৌড়ে পালাতে, কিন্তু কোমর তার ভেঙে গেছে। বাড়িসুদ্ধ লোক ভেঙে পড়লো তাকে দেখতে—তার অসহ্য ব্যথা কেউ বুঝলো না—তারা দেখলো শোভা, দেখলো মজা!

সে যখন ভাষাহীন যন্ত্রণায় ফণা তুলে কাঁপলো, যন্ত্রণায় নিজের সর্বশরীর কামড়ালো—দু'চোখ দিয়ে কত আবেদন জানালো—তখন সবাই হাততালি দিয়ে দেখতে লাগলো তার খেলা। তারপর সেখানে একটা তরল কী জিনিস ঢেলে তাতে জ্বালিয়ে দিলো আগুন। ধীরে-ধীরে পুড়ে ছাই হয়ে গেল তার অপূর্ব দেহ-সুষমা।

বড়োপিসির ছোটোছেলে

মিনুর আজ মন ভালো না। বড়োপিসির বাচ্চাটাকে দেখে থেকেই যে কেমন ভার হয়ে আছে, কিছুতেই যেন আর হালকা হচ্ছে না। সবটাতেই তাই আজ তার রাগ আর বিরক্ত।

মা বললেন, 'কী রে, আজ তোর হলো কী? এই দেখি দু'দিন ধরে কখন বড়োপিসি আসবে সেই আশায় লাফাচ্ছিলি, এখন তো কই একবার কাছেও এলি না!'

বড়োপিসি হেসে বললেন, 'ছোটোপিসিই ওর আসল পিসি, আর আমি ত নেহাত পর, না রে?'

'তা বাবা ও তোমাকে বড়ো হয়ে দেখেছেই বা কতটুকু! তুমি ত বছরে একবার আসবারও সময় পাও না!' মিনুর মা অনুযোগ করবার সুযোগটুকু ছাড়লেন না।

কথাটা সত্যি। তিনি আসেন খুব কম। মস্ত তাঁর সংসার, সময় সুযোগ আর হয়ই না। এও নিতান্তই পুজো উপলক্ষ্যে মিনুর বাবা জোর করে নিয়ে এসেছেন। তাও মাত্র দু'দিনের জন্য। বাচ্চা কাচ্চাদেরও সব আনেননি। কেবল কোলেরটি, যেটা মিনুর ছোটপিসির ছেলের সমান, সেটিকে এনেছেন। মাথাভরা তার কালো কোঁকড়া চুল, ফুটফুটে ভরসা গায়ের রং, অর্থাৎ মিনুর ছোটোপিসির ছেলেটি যত কালো এ যেন তত ফরসা···তার মাথায় যত কম চুল এর যেন ততই ঘন। বাড়ীর সকলে তাকে নিয়ে একেবারে লোফালুফি করতে লাগলো।

অণিমা—মানে মিনুর ছোটপিসি—মাত্র দু'বছর বিয়ে হয়েছে তার—আর এই ছেলেই তার প্রথম। শ্বশুরবাড়িতে শ্বশুর-শাশুড়ি, দেওর ননদ, বড়ো-বড়ো জায়েরা—একেবারে ভর্তি বাড়ি, কাজেই দায়িত্ব কম। ঘন-ঘন বাপের বাড়ি আসায় কোনো অসুবিধে নেই তার। তা ছাড়া মিনুর বাবা সকলের ছোটো এই বোনটিকে বোধ হয় বেশিদিন না-দেখেও থাকতে পারেন না, তাই কয়েকমাস না-এলেই তাড়াতাড়ি আনতে ছোটেন। ছেলে হয়ে শরীর খারাপ হয়েছে বলে দু'মাস যাবৎ এসে আছে এখানে। এই পিসির তুলনায়—বড়োপিসি যে নিতান্তই দূরের মানুষ সে বিষয়ে আর সন্দেহ কী? অথচ তার নিজের পিসির ছেলের চাইতে এই পর-পিসির ছেলেটি যে এত সুন্দর হবে তা মিনু কেমন করে সহ্য করে? সারাদিন ধরে তাই ভারি বিচলিত হয়ে আছে সে। যতবার মিলিয়ে-মিলিয়ে দেখছে, ততবারই মন তার খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কী করবে সে? এখন সে কি করে?

অবশেষে সইতে না পেরে মনের কথাটা তার একমাত্র সমবয়সী মোক্ষদা-ঝির মেয়ের কাছেই খুলে বললো, 'আচ্ছা পেঁচি, তুই সত্যি করে বল তো, ছোটোপিসির ছেলেই দেখতে ভালো, না বড়পিসির ছেলে?'

'ওমা, সে আবার বলতে।' পেঁচি চোখ বড়ো করলো, 'বড়ো-পিসিমার ছেলে কী ফরসা, কী মোটা—'

'হ্যাঃ, তুই জানিস! ফরসা আর মোটা হলেই বুঝি সুন্দর হয়?'

'নিশ্চয়!'

'কক্ষনো না!'

'ইঃ তুমি বললেই যেন হলো। জিগ্যেস করো না সকলকে।'

'যা, যা, ভাগ এখান থেকে। সকলে আবার কী জানে রে?'

ভীষণ বিরক্ত হলো মিনু, তারপর হঠাৎ পেঁচিকে এক ধাক্কা মেরে ঠেলে ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেলো সেখান থেকে। সোজা গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বসলো চিলকুঠির ছাতে। দার্শনিকের মতো ভুরু কুঁচকে নখ খেতে-খেতে তৎক্ষণাৎ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে গেল।

বড়োপিসি আজই যাবেন রাত বারোটার গাড়িতে। মাত্রই দু-দিনের মেয়াদ, ভালো করে একটু সুখদুঃখের কথাও বলা গেলো না কারো সঙ্গে। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলেন। দুধ খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে নিচের ঘরে মিনুদের মশারির তলায় শুইয়ে রাখলেন বাচ্চাকে, তারপর বাকি সময়টুকু কথাবার্তাতেই কেটে গেল। ইলেকট্রিকের সংশ্রব-বর্জিত গ্রামের মতো জায়গা, অল্প রাত্রেই বেশি রাত্রের নিস্তব্ধতা নামে। এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় শেয়াল ডেকে উঠলো ক'বার, ঝিঁঝিঁর ডাক আরো তীব্র হলো। উঠে-উঠে বারে-বারে ঘড়ি দেখতে লাগলেন পিসিমা, শেষে নির্দিষ্ট সময়ে ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়ালো দরজায়। বাচ্চাকে চাপাচুপি দিয়ে মশারির তলা থেকে বার করে নিয়ে এলেন মিনুর মা, বললেন, 'আবার একবার সময় করে লক্ষ্মীপুজোর পরে এসো ঠাকুরঝি —আর কার্তিক মাসের হিম, দেখো, ছেলেটার ঠাণ্ডা না লাগে!'

মিনু শুয়েছিলো, কিন্তু জেগে ছিলো। সবাই ভাবলো ঘুমুচ্ছে, কেউ তাই ডাকলো না। আস্তে-আস্তে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠলেন পিসিমা, গাড়ি ছাড়লো—শেষে গাড়ির আওয়াজ যখন মিলিয়ে গেল, লণ্ঠন নিবিয়ে মা-বাবা শুলেন এসে তার কাছে, আর ছোটোপিসি গেল দোতলায় নিজের ঘরে। মিনু কিন্তু তখনো জেগে। কেউ টের পেলো না সে-কথা। আরো অনেকক্ষণ জেগে রইলো মিনু। নেবানো লণ্ঠনের কেরোসিন-গন্ধ নাকে লাগলো তার, তারপর কখন তন্দ্রা এলো।

বেশিক্ষণ না একঘণ্টাও হবে কিনা সন্দেহ, আবার ঘোড়ার খুরের আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গে একপাল কুকুরের চীৎকার শোনা গেল পাড়ায়। আর আশ্চর্য এই, তক্ষুনি ঘুম ভেঙে গেল মিনুর। অমনি কান খাড়া করলো সে। হঠাৎ একটা যেন ভয় নেমে এলো তার বুকে। ঠিক। যা ভেবেছিলো ঠিক তাই। গাড়ি এসে তাদের দরজাতেই থামলো। একটু পরে তাদেরই দরজার কড়া নড়ে উঠলো খটরখটর করে। এদিকে এইটুকু সময়ের মধ্যেই গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছেন মা বাবা। জোরে জোরে কড়া নাড়তে লাগলো, তবু তাঁরা ঘুমুতেই লাগলেন। মিনু চুপ। শেষে ডাক এলো জোরে-জোরে, 'দাদা, ও দাদা, মিনু, মিনু, বৌদি!'

সঙ্গে-সঙ্গে ধাক্কা। এতক্ষণে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন মা বাবা। তক্ষুনি গেলেন দরজা খুলতে, আর মা মশারির তলা থেকে বেরিয়ে হাতড়ে-হাতড়ে লণ্ঠন জ্বালতে বসলেন। ওপরের ঘরে হঠাৎ চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো মিনুর ছোটোপিসির ছেলে ঘুমচোখে অণিমা চাপড়াচ্ছে ছেলেকে নিচে থেকেই তার শব্দ পেলো মিনু। ছেলে কিন্তু থামে না। পাঁচমাসের বাচ্চার গলায় কী জোর! লণ্ঠন জ্বালতে-জ্বালতে মিনুর মা বললেন, 'ইশ, কী কাঁদছে ছেলেটা!'

দরজা খুলে দিয়ে বোনকে দেখে মিনুর বাবা তো অবাক!

'কী রে, ব্যাপার কী? ফিরে এলি যে?'

'এলাম কি সাধে? আর-একটু হলে কী কাণ্ডই হতো দাদা!'

লণ্ঠন হাতে মিনুর মা দাঁড়ালেন গিয়ে। 'কী হয়েছে ঠাকুরঝি?'

'অণু কী করছে বলো আগে।'

'কেন?'

'ছেলে যে কাঁদছে ও কি শুনছে না?'

'ও, তাই বলো!' মিনুর মা আশ্বস্ত হলেন। 'শুনছে না।

আমাদের কান ফেটে যাচ্ছে—আর ও শুনছে না ?'

'তাকে ডাকো। ছেলে নিয়ে নিচে আসতে বলো, ওর কি ধারণা ওই-ছেলে ওর কাছে থামবে ?'

'হয়েছে কী বলো তো ?' মিনুর বাবা অস্থির হয়ে বললেন।

'এই ছাখো !'

বড়োপিসি কী দেখালেন কে জানে। মিনু তো দেখছে না, মিনু তো কেবল শুনছে। কিন্তু সেই শুনেই তার হাত-পা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগলো।

'ও মা সে কী !'

'এ কী অসম্ভব কাণ্ড।'

"তবে বলছি কী ? আরে, আমি তো জানতেই পারতাম না কিছু।' বড়োপিসি বললেন, 'গাড়িতেও উঠে বসেছিলাম, তারপর গাড়ি যখন ছাড়ে ছাড়ে, হঠাৎ বাচ্চাটা কেঁদে উঠলো একটা হুইসিলের শব্দ শুনে—আর কান্না শুনেই চমকে চেয়ে দেখি, এই ! আমি তো একেবারে থ ! —হুড়োহুড়ি করে গাড়ি থেকে যে কী করে নেমেছি !'

তিন লাফে সিঁড়ি ডিঙিয়ে নেমে এলো অণিমা। কোলে তার ছেলে ঝুলছে, আর চীৎকার করছে পাড়া ফাটিয়ে।

'ও বৌদি ! বৌদি ! ছাখো কী সর্বনাশ হয়েছে !' তার গলার স্বর শুনে মনে হলো, ভয়ে ভাবনায় কান্নায় এক্ষুনি যেন ভেঙে পড়বে সে।

'কেন, কী হয়েছে ?' একটু হাসলেন মিনুর মা। ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে এগিয়ে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো অণিমা, তারপর আনন্দে আকুল হয়ে উঠলো বড়দিকে দেখে।

'ওমা, তুমি ! তুমি ফিরে এসেছ তাহলে ? ইশ, আমার বুকটা যে

কী-রকম করছে! কী হতো চলে গেলে!'

'কী হতো চলে গেলে!' মনে-মনে ছোটোপিসিকে ভেঙচিয়ে উঠলো মিনু। বুকের মধ্যে আবার কেমন করছে! ঢং! রাগে হাত-পা কামড়াতে ইচ্ছে করলো তার। ছোটোপিসির মতো এমন একটা ক্যাবলা সে জন্মে ছাখেনি।

'আচ্ছা, তুই কী বল তো!' নিজের ছেলেকে টেনে কোলে নিয়ে শান্ত করতে-করতে বড়োপিসিমা বললেন, 'কান্না শুনেও বুঝিস না?'

'ঘুমের মধ্যে বুঝবো কী ছাই, তাছাড়া এমন একটা কথা মানুষে ভাবতে পারে?'

বড়োপিসির ছেলে মায়ের গন্ধ পেয়ে তক্ষুনি চুপ করলো আর অণিমা নিজের ঘুমুনো ছেলের কালো গালে অজস্র আদর বর্ষণ করতে-করতে হেসে উঠলো জোরে।'

মিনুর বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ রে অণি, তোর ছেলে ঘুমোলো দোতলার ঘরে আর ওর ছেলে একতলায় আমার বিছানায়, কী করে এই ব্যাপারটা হলো বল দেখি?'

'সত্যি! আমিও তাই ভাবছি। অণিমার ছেলে তো সেই সন্ধ্যে থেকে ঘুমুচ্ছে। নিচে আর নামেইনি মোটে আর বড়োঠাকুরঝির ছেলেকে শোওয়ালো রাত দশটায়, কী করে ওপরেরটি নিচে আর নিচেরটি উপরে গিয়ে হাজির হলো বল তো? বাচ্চা দুটো পরী নাকি?'

'সত্যি!'

'সত্যি!'

বিছানায় চোখ টিপে তখন প্রাণপণে ঘুমের চেষ্টা করছে মিনু। বড়োদের মত বোকা সত্যি আর দেখেনি সে। ভালো করলে ভালো

চায় না, কেবল খুঁতখুঁত! এ কেমনতর স্বভাব! আড়ি! আড়ি! আড়ি! জন্মের মতো আড়ি ছোটোপিসির সঙ্গে।

মোক্ষদা-ঝি এতক্ষণে উঠে এলো চোখ রগড়াতে-রগড়াতে। 'ও মা, সি কী গো, বড়দিদিমণি ফিরে আইলে যে?'

'এ মোক্ষদারই কাণ্ড! ও মোক্ষদা—' এতক্ষণে খেই পেলো অণিমা। 'বাচ্চা বদল করেছে কে গো?'

'বাচ্চা বদল? এ আবার কী কথা?'

'কী আবার! উপরের বাচ্চা নিচে আর নিচের বাচ্চা উপরে। কে করলো এ কাণ্ড?'

'বলছো কী তোমরা? আমি তো বাপু কিছুই বুঝতে পারছি না।' সত্যিই অবাক হলো সে।

'সত্যি তুমি জানো না কিছু?'

'সত্যি না!'

'ও দাদা, এ কী ভূতুড়ে কাণ্ড!'—অণিমা একটু ভিতু মানুষ, তার প্রায় গা ছমছম করতে লাগলো। 'তোমার মেয়েকে ডাকো দেখি মোক্ষদা!'

এইবার মিনু তড়াক করে উঠে বসলো, কুলকুল করে ঘাম নামলো তার পিঠ বেয়ে, হুড়মুড়িয়ে মশারি-টশারি ছিঁড়ে খাটের তলায় গিয়ে ঢুকলো সে। এই অন্ধকারে খাটের তলা! কী ভীষণ ভাবো। খাটের উপরে বসে যে-মানুষ খাটের তলার ভয়ে পা ঝোলায় না, সে-মানুষ এমন অকাতরে ঢুকে গেলো সেখানে! আর সেই তলাও কি যেমন-তেমন তলা? ট্রাঙ্কে, বাক্সে, বাসনে, বিছানায় মশার গানে—একখানা জাদুঘর একেবারে! কটা চোর আর কটা ভূতের ছানা যে লুকিয়ে আছে সেখানে তার ঠিক আছে কিছু? কিন্তু কী করা! তার

আর এখন ভয়ডর কী! বাড়ির লোক হয়েও এরা এখন তার যত শত্রু, তার চেয়ে আর কে বেশি। এদের হাতে ধরা পড়ার চেয়ে যে ভূতের পেটে যাওয়াও অনেক ভালো। কিন্তু ছোটোপিসিটা কী রে? ক্যাবলা, একদম ক্যাবলা!

মোক্ষদার মেয়ে উঠে এলো ঘুমে ঢুলতে-ঢুলতে। মিনুর বাবা বললেন, 'এই বড়োপিসিমার ছেলেকে উপরে নিয়ে, ছোটপিসিমার ছেলেকে নিচে এনে শুইয়েছে কে রে?'

'আমি জানি না।' তারা কান্না প্রায় পড়ো-পড়ো।

'জানিস না মানে? ঠিক করে বল।' ধমক দিলেন মিনুর বাবা।

অণিমা বললো, 'আমার কিন্তু ভাই একটা কথা মনে হচ্ছে।' এ-কথা শুনে খাটের তলায় মশায় কামড় খেতে-খেতে কেঁপে উঠলো মিনু।

বেশি জেরা করতে হলো না। একটু পরেই নাকিসুরে সব কথা ফাঁস করে দিলো পেঁচি।

বেচারা মিনু! একেবারে যেন মরমে মরে গেল। ইশ! পেঁচিটাকে একবার হাতের কাছে পেলে হয়। এই মিথ্যাবাদীটাকে কিছু না জানানোই উচিত ছিলো তার। কিন্তু বলেছে কি ইচ্ছে করে? তার সাধ্য কি, বড়োপিসির অতবড়ো ভারি ভোটকা ছেলেটাকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে সে একা ওপরে ওঠে। আর ছোটপিসিকেও বলিহারী যাই, এই নেড়া কালো ছেলেটাই কি তার অমন সুন্দর ছেলেটার চাইতে ভাল হলো? বড়োপিসিমা যখন ফিরে এলেন তখন বললেই হতো—না বাপু, আর আমি এই ছেলে ফিরিয়ে দেবো না। মা বাবাই বা কেমন?

একরাশি হাসি শুনে হঠাৎ মিনু চমকে উঠলো। রাত দুপুরের

স্তব্ধ বাড়ি ভেঙে খানখান্ হয়ে গেল মা-বাবা আর পিসিদের হাসিতে। 'ও মিনু, মিনু'—হাসতে হাসতেই ছুটে এলেন ছোটোপিসি—এলেন বড়োপিসিমা, মা, বাবা মোক্ষদা সব। মিনু কই?

মিনু খাটের তলায় বড়ো-বড়ো নিশ্বাস নিচ্ছে চোখ বুজে। বুকের ভিতর যেন একটা ইঞ্জিন চলেছে ধকধক করে পুরো দমে। এমন লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা, মনে হলো এক্ষুনি বা ফেটে যায়। যাক। যাক! ফেটে গেলেই সে বাঁচে! তার মরে যাওয়াই ভালো। হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়ে ভয়ে একেবারে হিম হয়ে গেল সে। হায়! হায়! বড়োপিসেমশায় যে পুলিশের দারোগা—আর তার ছেলেই চুরি? কী হবে?

এইবার আর পারলো না মিনু। লজ্জা সরম সমস্ত ভুলে সেই খাটের তলা থেকেই প্রকাণ্ড জোরে 'ভ্যাঁ' করে কেঁদে উঠলো।